প্রবেদন

নরকোৎসব ইহ-পর-কালের কর্ম্মস্মৃতি-মাথান—ইহ-পর-কালের ভাগ্যভঙ্গ-গড়ান—ইহ-পর-কালের পাপ-পুণ্য-জড়ান কয়টী মানব-মানবীর ইতিহাস।

ইহাতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কল্পনার কমনীয় ক্রীড়া-কাহিনী নহে, অধ্যাত্ম-জগতের সত্যবারতা।

এই পুস্তকের প্রায় চারি ফর্ম্মা পর্য্যন্ত "অলৌকিক-রহস্য" নামক অধ্যাত্ম-তত্ত্ব-বিষয়ক বিখ্যাত মাসিকপত্রে প্রচারিত হয়। তারপরে নানারূপ অনিবার্য্য কারণে উক্ত পত্রের পরিচালকগণের পুনঃ পুনঃ তাগিদসত্ত্বেও অবশিষ্টাংশ তখন লিখিয়া দিতে পারি নাই। বর্ত্তমানে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার নিতান্ত প্রয়োজন হওয়ায়, আর তাহাতে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতে দিয়া সময় নষ্ট করিতে পারিলাম না, এজন্য উক্ত পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক ও গ্রাহকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ইতি—

অনন্তপুর,
১৮ই ভাদ্র,
১৩২১ সাল।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

প্রথম চক্র

নরকোৎসব।
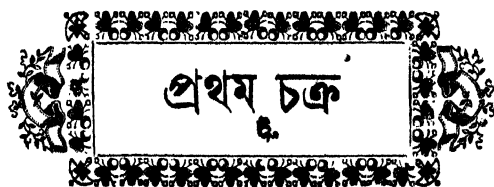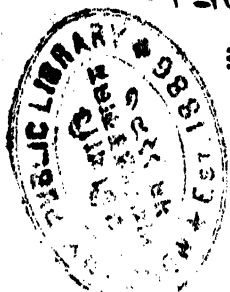
প্রথম উল্লাস।

উপাদান।

সকল কথা গুছাইয়া বলিতে পারিতেছি না, অন্তর্দাহে বড়ই দগ্ধ হইতেছি। আমার যন্ত্রণা তোমরা বুঝিতে পারিবে না। বাতাসটুকু পর্য্যন্ত আমার নিকট যেন অবরুদ্ধ পাহাড়! যখন না শুনিয়া ছাড়িবে না. তখন যত সংক্ষেপে পারি, বলিতেছি; শুনিয়া যাও।

সে অনেক দিনের কথা। কত দিন, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। কিন্তু আমার স্মরণ আছে, তখন শীতকাল। অনুমান, দশ বৎসরের কথা। বন্ধু বিজয়কুমার আসিয়া অনুরোধ করিলেন, থিয়েটার দেখিতে যাইতে হইবে। আপত্তি করিলাম না। যৌবন-বল-দৃপ্ত দেহ,—সংসারে কোন পাপ আছে, ব্যসন আছে, কোন বাধা বিঘ্ন বা দারীত্ব আছে, এমন মনেও আসিত না। সন্ধ্যার পর পশমী অলষ্টারে দেহ আবৃত করিয়া, সিগারেট টানিতে টানিতে বন্ধুর সহিত রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইলাম।

সাড়ে নয়টার সময় অভিনয় আরম্ভ হইবার কথা। আমরা কিন্তু নয়টারও পূর্ব্বে আসনাধিকার করিয়াছিলাম। তবে আমরাই যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাতিকগ্রস্ত, তাহাও নহে; আমাদের উপরেও ছিল; কারণ নয়টার সময় গিয়াও আমরা পিটের পিটে বসিয়াছিলাম।

তখন অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাড়া-শব্দও ছিল না, কৃষ্ণ যবনিকায় সম্মুখভাগ সমাচ্ছন্ন। ঐকতান বাদকগণও দর্শন দেয় নাই। তাহা হইলেও দর্শকগণের যে কিছুমাত্রই কাজ ছিল না, এমন বলা যাইতে পারে না। যাঁহারা গম্ভীর প্রকৃতির লোক, তাঁহারা দার্শনিকের ন্যায় স্থিরভাবে বসিয়া নীরব হইয়া সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রঙ্গমঞ্চের স্থান-অস্থান সর্ব্বত্র দর্শন করিতেছিলেন। যাঁহারা চঞ্চল, তাঁহারা নাট্যকারের ন্যায় পাঁচরকম ভাব, পাঁচরকম ভাষা, পাঁচরকম কাজের একত্র অবতারণা করিয়া হট্টগোল তুলিতেছিলেন। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত শান্ত, তাঁহারা কবির ন্যায় সর্ব্বত্রই সুন্দর দেখিয়া আপনভাবে আপনি মাজতে চেষ্টা করিতেছিলেন। আর যাঁহারা প্রেমিক, তাঁহারা প্রেমের সন্ধানে নয়ন দুইটীকে ছিদ্র-পথে পাঠাইয়া প্রেমের নববারতা আনাইবার জন্য ব্যস্ত হইতেছিলেন :—ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি ও আমার বন্ধু বিজয় সেবার বি এ পরীক্ষা দিব। আমাদের হৃদয় আশার নবীন কুহেলিকায় তখন সম্যক্ সমাচ্ছন্ন। আমরা সেই গল্পে এবং ভবিষ্যৎ জীবনের আনন্দ-আলেখ্যের কথোপকথনে সময় কাটাইতেছিলাম। সহসা আমার দৃষ্টি দক্ষিণদিকের দ্বিতলের উপর গেল, সেখানকার 'বক্সে' একটি পুষ্টাঙ্গী রমণী কয়েকটী বালকবালিকা লইয়া উপবিষ্টা ছিলেন। পার্শ্বের প্রলম্বিত পর্দা উন্মুক্ত—সম্মুখে এক সুন্দরী ষোড়শী।

ষোড়শীকে ভালরূপে দেখা যাইতেছিল না, কেবল কৃষ্ণতার দীর্ঘায়ত

লোচনযুগল এবং অনিন্দ্যসুন্দর সহাস্য মুখখানিই দেখা যাইতেছিল। আশ্চর্য্য এই যে, সেই চঞ্চলোজ্জ্বল চক্ষু দুইটীর দৃষ্টি আমাদেরই দিকে

অপরিচিতা ভদ্রকন্যাকে এরূপভাবে দর্শন করা অন্যায় মনে করিয়া নয়ন ফিরাইতেছিলাম, ঠিক এই সময় যুবতী ব্যস্তভাবে আগ্রহসহকারে নই স্থূলাঙ্গিনীকে নিজের স্বর্ণচাঁপার মত অঙ্গুলীনির্দ্দেশে আমাদিগের দিকে কাহাকে দেখাইয়া দিল। প্রৌঢ়া চাহিয়া দেখিয়া উন্মুক্ত পর্দ্দা টানিয়া দিলেন। কিন্তু এমনভাবে টানিয়া দিলেন, যাহাতে তাঁহারই সর্ব্বাঙ্গ লোক-লোচনের অন্তরালে যায়। যুবতীকে তিনি তাদৃশ সাব- ধান করিলেন না। মনে ভাবিলাম, আমাদেরই নিকটে হয় ত উঁহাদের গান আত্মীয় আছেন, যুবতী সেই আত্মীয়কেই অঙ্গুলী নির্দ্দেশে খাইতেছে। ইহার কিছু পরেই ঐকতান বাদ্য বাজিল এবং আরও ক্ষণ পরে অভিনয় আরম্ভ হইল।

সেদিন গিরিশবাবুর "দক্ষযজ্ঞ" অভিনয় হইতেছিল। দুই-তিনটা ভাঙ্কের অভিনয় বেশ নিবিষ্ট মনেই দর্শন করিয়াছিলাম। সতী ও তপস্বিনীর ভূমিকা লইয়া দুইটী অভিনেত্রী রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূতা হইয়া ন গাহিতেছিল। গানটি বড় মিষ্ট, বড় মধুর লাগিতেছিল। কেন নি না, কোন্ আকর্ষণে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই সময় একবার ঊর্দ্ধদিকে ষ্টিক্ষেপ করিলাম। দেখিলাম, যুবতীর উজ্জ্বলতার চক্ষু দুইটী আমারই খের উপর সংস্থাপিত। আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, যুবতী চক্ষু রাইল। গায়িকাদ্বয় গান সমাপ্ত করিয়া ফিরিতেছিল, কিন্তু দর্শকেরা "ইনুকোর" দেওয়ায় তাহারা সেই গানটি পুনরায় গাহিল ;—

"ফিরে চাও প্রেমিক সন্ন্যাসী।
ঘুচাও ব্যথা, কওনা কথা,

কার প্রেমে হে উদাসী!
রয়েছ মত্ত ধ্যানে,
তত্ত্ব তোমার কে বা জানে!
অনুরাগী সুধাই যোগী,
প্রাণ দিলে কি লও হে আসি?"

বন্ধু বিজয়কুমার "প্রেম-পীরিতি"র বাহিরে। তিনি বিরক্ত হইয় উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন—"ও ছাই গানেও ইন্‌কোর"!

যুবতী বুঝি তাহা শুনিতে পাইল। সে মুচ্‌কি হাসিয়া পার্শ্বের পর্দা সরাইয়া দিল। আর তাহাকে দেখা গেল না।

সে হাসির বর্ণনা করিতে পারিব না, ভাব বুঝাইয়া দিতে পারিব না, উপমা দেখাইতে সক্ষম হইব না,—তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি,—

হাসি-মদির-ধারা
তোলে বিষামৃত জ্বালা

তোমরা কেহ কখনও এ মদিরা পান করিয়াছ কি?

দ্বিতীয় উল্লাস।

ক্ষেত্র।

তার পরে রঙ্গালয়ে অনেকক্ষণ ছিলাম ; সত্য কথা বলিতে কি, সেদিন আমি ভাল করিয়া অভিনয় দর্শন করিতে পারি নাই। কিসের পর কি হইল, কাহার পরে কে আসিল, কে কাহাকে কি বলিল, তাহা গুছাইয়া দেখিতে বা শুনিতে পাই নাই। চক্ষু ও মন অধিকাংশ সময়ই দ্বিতলোপরি সেই ষোড়শীর পার্শ্ববর্ত্তী লম্বিত পর্দাপ্রান্তে লুব্ধ ক্ষুব্ধ আর্ত্ত পথিকের মত ঘুরিয়া ফিরিতেছিল।

যথাসময়ে অভিনয় সমাপ্ত হইয়া গেল। রঙ্গমঞ্চের শেষ যবনিকা পড়িল। মনে মনে রাগ হইল, এত শীঘ্র কি এমনই করিয়া অভিনয় শেষ করিতে হয়! না হয়, দর্শকদিগের নিকটে আর কিছু দাম ধরিয়া লইয়া সমস্ত রাত্রিটুকু অভিনয় করিলেই হইত? "জলদে লুকাল পূর্ণ-শশধর, পিয়াসা রহল পূরিয়া।" আর একবার চাহিলাম, দেখিলাম, সেই অম্লান পঙ্কজ মুখখানি আরও সুন্দর দেখাইতেছে। সেও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে! এইবার শেষ চক্ষুতে চক্ষুতে মিলন! তারপরে সব ফুরাইল! সে চলিয়া গেল, আমিও চলিয়া গেলাম।

সে কোথায় গেল, জানিতে পারিলাম না। একবার ইচ্ছা হইল, অনুসন্ধান করি। আবার মনে হইল, কেন? কিসের জন্য? কে সে? তাহার অনুসন্ধান করিয়া আমার কি লাভ হইবে? কাজেই বন্ধুর ইত রাস্তায় বাহির হইলাম।

রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিলাম, রাত্রি শেষ হইয়া গিয়াছে। ঊষার

শীতল বাতাসে আরও শীত বৃদ্ধি করিয়াছে, এবং জন-কোলাহল-মুখরি ত মহানগরীর রাস্তায় তখন অল্প লোকের সাড়া-শব্দ মিলিতেছে।

আরও কিছু দূর গমন করিয়া বন্ধু বিদায় লইয়া তাঁহার বাড়ীর রাস্তা ধরিলেন, আমিও আমার বাড়ীর দিকে চলিলাম; কিন্তু সেই মুখখানির অত্যন্ত অভাব জ্ঞান করিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল, সে মুখ বুঝি জীবনে আর দেখা হইবে না। যদি না হয়, তবে এজীবনের উদ্দেশ্য কি? স্বর্গের কথা শুনিয়াছি, বুঝি সে এমনই সুখ-সৌন্দর্য্য দিয়া সংগঠিত। পারিজাত পুষ্প, পূর্ণচন্দ্রের প্রফুল্ল জ্যোৎস্না, মৃদু মারুতের মধুরতা, আর কবিতার কমনীয় ভাব এসকল একত্রে ছানিয়া মথিয়া বিধাতা বুঝি সেই মুখখানির সৃষ্টি করিয়াছেন! কি করিলে, তাহা সর্ব্বদা চোখের সম্মুখে রাখা যায়? কোন্ যজ্ঞের অনু-ষ্ঠানে সে স্বর্গ-সুখ লাভ করা যায়? অশ্বমেধ, না নরমেধ? পার্শ্বের বাড়ীর ছাদ হইতে ঠিক এই সময় একটা নিশাচর পাখী বড় কর্কশকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল। সেটা কি পাখী বুঝিতে পারিলাম না। সে যেন সেই কর্কশস্বরে বলিয়াছিল, "নরমেধ গো নরমেধ!"

প্রভাতের আলো সম্পূর্ণ বিকশিত না হইতেই বাড়ী পঁহুছিলাম। তখনও আমি অবিবাহিত। বাহিরের ঘরে বিছানা ছিল, শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু নিদ্রা হইল না, অবশিষ্ট অন্ধকারটুকু সেই মুখের কল্পনা-লোকে কাটাইয়া দিলাম।

সেইদিন হইতে "সো রূপ লাগ্ রহি, হৃদয়ে হামারি।" আর ভুলিতে পারিলাম না। নাটক নভেল পড়িলে নায়িকার সৌন্দর্য্য বর্ণনে তাহার কথা মনে পড়িত। উদিত চন্দ্র দর্শনে, পুষ্পগন্ধ আঘ্রাণে, নদীর কল্লোল শ্রবণে, শর্করার মধুর রস আস্বাদনে, মৃদু মারুত স্পর্শে তাহারই কথা মনে পড়িত। কিন্তু কে সে? কোথায় সে?

এইরূপে ছয় মাস উত্তীর্ণ হইয়া গেল ?

ইহার মধ্যে আমি বি, এ, পাশ করিয়াছিলাম। বাবা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিলেন, বি, এ, পাশ না করিলে আমার বিবাহ দিবেন না। আমাদের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। বাবার মত এই ছিল যে, নিজে উপার্জ্জন করিতে না পারিলে, অথবা উপার্জ্জন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইবে, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে না পারিলে, বিবাহ দেওয়া উচিত নহে।

আমাদের বাটী সিমলা ষ্ট্রীট, জাতিতে আমরা উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ। আমার নাম মধুসূদন ঘোষ,—পিতার নাম ধনঞ্জয় ঘোষ। বাবার একখানা কাঠের দোকান ছিল, এবং তাহারই আয়ে আমাদের চারি-পাঁচজন লোকের কোন প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। তবে মধ্যবর্ত্তী গৃহস্থের মতই সংসার চলিত। আমার পড়া-শুনাতেও মোটা খরচ হইত। কাষ্ঠবিক্রেতার পুত্র বলিয়া জমিদার রাসবিহারী বাবুর পুত্রের পোষাক-পরিচ্ছদের সহিত আমার পোষাক-পরিচ্ছদের কোনরূপ পার্থক্য ছিল না, সেজন্য ব্যয়াধিক্য হইয়া পড়িয়াছিল। উঁচু চালে যেমন এখনকার সকলেরই দেনা দাঁড়াইয়া যায়, আমার পিতারও তদ্রূপ কিছু দেনা হইয়া পড়িয়াছিল।

বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই আমার অনেক বিবাহসম্বন্ধ যুটিতেছিল, আমি যেমন যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কা পাইতেছিলাম, তেমনি তেমনি আমার দর বৃদ্ধি হইতেছিল। কিন্তু বাবার সেই "ধনুকভাঙ্গা পণ।"

এবার কিন্তু বাবাকে নিরুত্তর হইতে হইল। "বি, এ, পাশ করিলে বিবাহ দিব," বাবাকে এই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া পূর্ব্বপরিচিত অনেক কন্যাভার-ক্লিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত হইতে লাগিলেন। তখন দর "উঠা-নামা" হইতে লাগিল। বহুবাজারের শশিমিত্র মহাশয় নগদ

চারি হাজার টাকা, কন্যার আপাদ-মস্তক আভরণ ও জামাতার চেইন-ঘড়ী প্রভৃতি বৃষাভরণ (?) দানে স্বীকৃত হইয়া,দিন স্থির করিয়া গেলেন। ক্রমে আমার বিবাহের দিন ঘনাইয়া আসিল।

আমি ভাল করিয়া কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিলাভ জন্য যে সকল অজীর্ণ পদার্থ জীর্ণ করিয়াছি, এটা যেন তাহা হইতে আরও কঠিন, আরও দুষ্পাচ্য বলিয়া জ্ঞান করিলাম। উদরমধ্যে পড়িয়া চিন্তনীয় পদার্থটি অহর্নিশি গড়াগড়ি পাড়িতে লাগিল।

আমার মনে হইত, বিবাহ করিব কি না! বিবাহ করা কিসের জন্য? সুখের জন্য, ভালবাসার জন্য। কিন্তু ভালবাসিব কি প্রকারে? সেই যে, 'অচেনা অজানা মুখ' এক মুহূর্ত্তে প্রাণের সবখানি জায়গায় তাহার স্মৃতির ছাপ রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেখানে কি আর কিছুর স্থান হইবে? যদি না হয়, তবে বিবাহ কেন? অতএব বিবাহ না করাই উচিত। চিরদিন তাহার স্মৃতি লইয়া তাহারই প্রেমের প্রতীক্ষায় কাটাইয়া দিব। কিন্তু কাহার প্রতীক্ষা করিব! কে সে? কোথায় সে? কাহার সে? কলিকাতার সমস্ত রাস্তা, সমস্ত অলি-গলি অনুসন্ধান করিয়াছি কোথাও ত তাহার চরণের অলক্তক রাগের এতটুকু দাগও দেখিতে পাই নাই!

তৃতীয় উল্লাস।

মিলন।

হঠাৎ একদিন আমাদের প্রাঙ্গণে আমারই প্রাণের মত নীলবর্ণে রঞ্জিত চন্দ্রাতপাচ্ছাদিত আবিল রৌদ্র ভাসিতে লাগিল। তাহার তলে যোষিৎ-গণ আমার সর্ব্বাঙ্গে হরিদ্রা মাখাইয়া দিলেন; দুই-তিনটা মঙ্গল-শঙ্খ বাজিল, এবং দরোজায় বসিয়া সানাইওয়ালা তিলক-কামোদ রাগিণীর মিঠা আওয়াজে প্রতিবাসীদিগকে গাত্র হরিদ্রার শুভ বারতা শুনাইয়া দিতে লাগিল।

তাহার তিনদিন পরে বিবাহের শুভলগ্নে সম্প্রদান সভায় বরাসনে বসিয়া অনেক মন্ত্র পাঠ করিলাম এবং সম্প্রদানকার্য্যের অসম্পূর্ণাবস্থায় স্ত্রী-আচারের জন্য অন্দরমহলে প্রেরিত হইলাম।

অভিমন্যুর ন্যায় সেখানে আমি সপ্তরথী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইলাম। ভীমাদির ন্যায় মৎসম্পর্কীয় দু-একজন সে চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া প্রবেশের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যর্থচেষ্ট হইয়া ফিরিয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সপ্তরথী বলিয়া ব্যাকরণ ভুল করিয়াছি। তবে আমি নব্য শিক্ষিত, নব্যশিক্ষার মহিমা বলে যখন নলপ্রিয়া মুখোপাধ্যায়, রেণুকা দাস প্রভৃতি সভাপত্নী না হইয়া সভাপতি হইতেছেন, তখন সপ্তরথী বলিয়া এমন কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি?

চতুর্দ্দিকে অলঙ্কারের মধুর ধ্বনি, হাসি ও বাক্যালাপের বেণু-বীণা-বংশী-নিন্দিত স্বর বিস্তার, চাহনির কুসুম-কমনীয়তা ও কটাক্ষের বিদ্যু-

দাম স্ফুরণ, আমি মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান! কোন্ জ্যোৎস্না-সোপান বহিয়া কোন্ চাঁদের দেশে চলিয়া যাইব ;—কোন্ সুখ-সরসির কমল-কাননে মধুচক্রের মধু-গন্ধে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িব, শুদ্ধশ্বাসে ভাবিতেছি, এমন সময় হঠাৎ আমার সমস্ত হৃদয় আলোড়ন-বিলোড়ন করিয়া, সমস্ত হৃদ্পিণ্ডে এক মহা বৈদ্যুতি-প্রবাহ তুলিয়া দিয়া, দেহের সমস্ত অণু-পরমাণুতে বিষামৃত মাখাইয়া দিয়া 'সেই মুখখানি' সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

যে মূর্ত্তি রঙ্গালয়ে দর্শন করিয়াছিলাম, এতদিন যাহার ছবি হৃদয়ের নিভৃত সিংহাসনে রাখিয়া পূজা করিয়া আসিতেছিলাম, আজি তাহা সম্মুখে দেখিতে পাইলাম।

যথাসময়ে বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। যাহার সহিত বিবাহ হইল, তাহাকে ভাল করিয়া দেখিলাম না—কোন কিছু বুঝিলাম না। কেবল এই তত্ত্ব বুঝিলাম যে, রঙ্গালয়দৃষ্টা সেই স্থূলাঙ্গিনী প্রৌঢ়া রমণী আমার শাশুড়ী এবং চিত্তহারিণী ষোড়শী আমার স্ত্রীর জ্যেষ্ঠ সহোদরা।

বাসরে তাহার সহিত কথোপকথন হইল। তাহার প্রত্যেক কথায় আমার ধমনীগুলা নাচিয়া উঠিতেছিল, প্রাণের কানে বেহাগের করুণ-মধুর ঝঙ্কার ঢালিতেছিল। প্রতি নয়ন-হিল্লোলে স্বর্গ-সুখের আস্বাদ-আনন্দ উপভোগ করিতেছিলাম।

আমার স্ত্রীর নাম ঊষা, আর তাহার নাম সন্ধ্যা। আমার বড় শ্যালিকা হইলেও তাহাকে সন্ধ্যা বলিয়াই অভিহিত করিব।

কত কথা, কত হাসি, কত রহস্য, কত গান-কবিতার পরে সন্ধ্যা আমাকে বলিল, "সেই একদিন থিয়েটারে দেখা হইয়াছিল, মনে আছে কি ?"

আমি। খুব মনে আছে।

সন্ধ্যা। তুমি কি আমায় চিনিতে পারিয়াছিলে ?

আমি। না, তার পূর্ব্বে ত কখনও দেখি নাই। তবে সেইদিন হইতে চিনিয়া রাখিয়াছি—এমন করিয়া চিনিয়া রাখিয়াছি যে, জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না।

সন্ধ্যা। সে কি ! আমায় ভুলিতে পারিবে না কেন ? পূর্ব্বে যদি আমাকে না চিনিতে, তবে তত ঘন ঘন আমার দিকে চাহিতেছিলে কেন ?

আমি। সে কথার উত্তর দিতে পারিব না। তুমি কি আমারই দিকে চাহিতেছিলে ?

সন্ধ্যা। হাঁ।

আমি। কেন ?

সন্ধ্যা। তোমার সহিত উষার বিবাহের কথা মার সাক্ষাতে আমিই প্রথমে বলি, কিন্তু তোমার পিতা বি, এ পাশ না করিলে তোমার বিবাহ দিবেন না বলেন। তাই মাকে তোমায় দেখাইয়াছিলাম। আর তুমি আমাকে জান বিবেচনা করিয়া, অভিনয়ের ভাল-মন্দ সমালোচনাস্বরূপে মধ্যে মধ্যে তোমার দিকে চাহিতেছিলাম।

সন্ধ্যার সে কৈফিয়তে আমি সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। সে কি তেমনি চাহনি ? আর তাহার সহিত তত নৈকট্যই বা কি ছিল ! যাহা হউক, সে কথার আর বাদপ্রতিবাদ না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি তোমায় আগে কখনও দেখি নাই। কিন্তু তোমার কথার ভাবে বোঝা গেল, তুমি আগেও আমাকে দেখিয়াছ ? আমার অনুমান ঠিক কি ?

সন্ধ্যা মৃদু হাসিয়া বলিল, "না দেখিলে বিবাহের কথা তুলিলাম কেন ? আর মাকেই বা তোমায় দেখাইতাম কি প্রকারে ?"

আমি। কোথায় দেখিয়াছিলে ?

সন্ধ্যা। আমার বিবাহ তোমাদের পাড়াতেই হইয়াছে।

আমি। আমাদের পাড়ায়! কার সঙ্গে ?

সন্ধ্যা। নাম বলিতে হইবে নাকি ? দে-চৌধুরীদের বাড়ী।

আমি। দে-চৌধুরীদের বাড়ী ;—ওঃ! কার্ত্তিকঠাকুরদা কি তৃতীয় পক্ষে তোমাকে বিবাহ করিয়াছেন ? কি ভাগ্যবান পুরুষ!

সন্ধ্যা। হাঁ,জীবনের সন্ধ্যাকালে তিনি সন্ধ্যারই মাথা খাইয়াছেন।

আমি। টাকা-কড়ি, গাড়ী-ঘুড়ী সবই আছে।

সন্ধ্যা। নাইক, কেবল প্রাণ। বৃদ্ধকালে সে জিনিষটা বড় রকমারি ভাব ধারণ করিয়া বসে। যাক্ 'ধান ভানিতে শিবের গীতে' প্রয়োজন নাই। তুমি একটা গান গাও।

আমি ভাল দেখিয়া, খুব মনের মত একটা প্রেমের গান গাহিলাম। সে নিশা বড় সুখেই কাটিয়াছিল। কিন্তু সে সুখ যে, এত দুঃখে পরিণত হইবে, এমন মর্ম্মবিদারণক্ষম কঠোর কুলীশাকার ধারণ করিবে, তাহা তখন মনে করি নাই। 'বুঝি মর্ত্তে সুখ কোথাও নাই। সুখ ডাকিলেই দুঃখ আসে, মিলন যাচিলেই বিরহ উপস্থিত হয়, জীবন থাকিলেই মরণ জাগিয়া উঠে।

চতুর্থ উল্লাস।

বীজ।

এইবার যাহা বলিব, তাহা শুনিয়া তোমরা শিহরিয়া উঠিবে। তা' উঠ; কিন্তু সাবধান হইতে পারিবে। যে অপরাধে আমি অপরাধী, সে অপরাধ যে, তোমাদের মধ্যে কাহারও নাই, তাহা মনে করিও না। সময়ে সাবধান হইতে পারিলে—স্মৃতির দাগ মুছিয়া ফেলিতে পারিলে, আগুনের হল্কা বুকে লইয়া ছুটাছুটি করিতে হইবে না। বড় ভয়ানক ব্যাপার! তোমাদের ধারণার অতীত—কল্পনার বহির্ভূত কাণ্ড! হইতে পারে, আমি রমণীর রূপে মজিয়াছিলাম; তুমি না হয় টাকায় ভুলিয়া আছ; তোমার বন্ধু না হয় ভোজন-দ্রব্যে ভুলিয়া আছেন; আর—ঐ নূতন কবি নয় প্রকৃতির নগ্ন সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া আপন ভুলিয়া অবস্থান করিতেছেন; কিন্তু সবই মজা;—মজার মজা অবশেষে! তবে কি তারতম্য নাই? তা আছে বই কি। যাক্, আমার কথাগুলা বলিয়া ফেলি।

তার পরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার খুঁটিনাটি আর না-ই বলিলাম। সেই শারদোৎফুল্ল সান্ধ্য-মল্লিকার শোভা-সুগন্ধ, সেই নির্ম্মল চন্দ্রমা-শালিনী মধুযামিনী, সেই কোকিল-বধূর ঝঙ্কৃতিময়ী বিরহ-বেদনা-জড়ান বেহাগরাগিণীর শেষ রেস্, সেই ফুল-পরিমলমাখা ধীরচালিত মলয়াশ্বাস, সেই বাঞ্ছিত-অভিসারগামিনী কলনাদিনী নদীর উচ্ছ্বাস, সেই কুসুম-হাসিনী মনোমোহিনী মন্থরগামিনী মদনোন্মাদকারিণী কামিনীর হাব-ভাব—যাহা যাহা সাহিত্যের হিসাবে প্রেমের সম্পদ্—প্রণয়ীর অত্যাব-

শুকীয় অবলম্বন, তাহা সকলই ছিল। সাবান, এসেন্স, আতর, গোলাপ, নভেল, নাটক, প্রেমের চিঠীর গোপন চটক,—প্রণয়ি-জন-বাঞ্ছিত এ সকলেরও অভাব কিছুরই ছিল না,—গোপন-মিলনের রোমাঞ্চকর কাহিনী, দিবানিশি উদাস-উন্মাদ-পথ-পানে চাহনি—তাহারও ত্রুটি ছিল না। তবে সে সকল আর একে একে গুছাইয়া মনে করিয়া বলিতে পারিতেছি না। এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখ যে, সন্ধ্যার সহিত আমার পাপ-মিলন হইয়াছিল;—এখন সেই পাপ-মিলনের ফলাফল যাহা, তাহাই শুনিয়া যাও।

বিবাহের পরে দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। আমার শ্বশুর-বাড়ীতে—সন্ধ্যার শ্বশুরবাড়ীতে—সন্ধ্যার সহিত আমার প্রায়ই সাক্ষাৎ হইত। যদিও সম্বন্ধের গুণে আমাদের উভয়ের নিভৃত আলাপে প্রথম প্রথম কেহ বাধা প্রদান করে নাই, কিন্তু ক্রমে ক্রমে যেন সকলেই সন্দেহ করিতে লাগিল। পাপ বুঝি এমনি করিয়াই প্রকাশ পায়! তার পরে সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হইল। একদিন আমার শ্বশুরবাড়ীতে আমার স্ত্রী আমাকে স্পষ্টই বলিল,"তুমি দিদির সঙ্গে অমন করিয়া কথা কহ, তাহাতে অনেক জনে অনেক কথা বলে।"

আমি মুখে খুব ধুমধাম করিলাম—কথা না কহিলে আমার কিছু-মাত্র ক্ষতি নাই, এমন কি এ বাড়ীতে নয় আর নাই আসিব—ইত্যাদি নানাবিধ বাক্যের অবতারণায় বীররসের অভিনয় করিলাম, কিন্তু কাজে যা, তাই রহিল।

শ্বশুরবাড়ীর ব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্তন ঘটিল না বটে, কিন্তু সন্ধ্যার শ্বশুরবাড়ীর অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, সেখানে আমার যাওয়ার পথ রুদ্ধ হইল, এবং সন্ধ্যাকে তাহার স্বামী লইয়া গেল, অনেকদিন আর পিত্রালয়ে পাঠাইল না। এই প্রকারে ছয় মাস কাটিয়া গেল।

এই দীর্ঘ বিরহ আমার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিল। সন্ধ্যাও স্বামীর কারাগৃহে পড়িয়া ছুট্‌ফট্ করিয়া মরিতে লাগিল। প্রতিদিনই সে তাহার মনোবেদনা ও অসীম যন্ত্রণা জানাইয়া ডাকে পত্র দিয়া আমাকে তাঁহার অবস্থা জানাইত। আমি উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম। তার পরে সন্ধ্যাকে পাইবার উপায় অনুসন্ধানে মনঃসংযোগ করিলাম, জীবন পর্য্যন্ত পণ করিলাম।

আরও এক মাস কাটিয়া গেল। সব 'তোড়যোড়' ঠিক করিতে এই মাসটা অতিবাহিত হইয়াছিল, সেই এক মাসই আমার পক্ষে অতি সুদীর্ঘকাল বলিয়া জ্ঞান হইয়াছিল। দুঃখের সময় দীর্ঘ হয়, সুখের সময় কম হয়; এটুকু খুব কঠিন দর্শনের কথা না হইলেও ভাবিবার বিষয়। যেখানে পূর্ণ সুখ, সেখানে কালব্যাপ্তির অধিকার নাই।

যাহা হউক, হঠাৎ একদিন অতি প্রত্যূষে পুলিসের রাঙ্গাপাগড়ীতে দে-চৌধুরীদের বাড়ী পূর্ণ হইয়া গেল। পাড়ার ভদ্রলোকেরা প্রায় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আর রাজপথগামী জনসঙ্ঘের বাহিরের ভিড়ে পাশ কাটায় কাহার সাধ্য! বাড়ীর মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল। কে বা কাহারা রাত্রিকালে সন্ধ্যার স্বামী কার্ত্তিক বাবুকে অতি নিষ্ঠুরভাবে নিহত করিয়া চলিয়া গিয়াছে!

একটা বিস্তৃত ও সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে দে মহাশয়ের ছিন্নকণ্ঠ রক্তাক্ত দেহ পড়িয়াছিল, পুলিসের ইন্‌স্পেক্টরমহাশয় চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিলেন। অনেক দেখিয়া শুনিয়া—অনেক রকম এজেহার আদি লইয়া, শবদেহ করোণার আফিসে প্রেরণ করিয়া তাঁহারাও চলিয়া গেলেন। সকলে বুঝিল, তাঁহাদের তদন্ত শেষ হইল।

করোণারের পরীক্ষায় প্রকাশ পাইল, কে বা কাহারা তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দ্বারা মৃতের কণ্ঠদেশ বিচ্ছিন্ন করিয়াছে এবং তাহাতেই মৃত্যু ঘটিয়াছে।

এই অভিনব আবিষ্কারে পুলিসের তদন্তের কোন আনুকূল্য হইল কিনা, তাহা তাঁহারাই জানেন ; কিন্তু কয়েকদিন আর কাহারও কোন উচ্চ-বাচ্য শোনা গেল না। এদিকে কার্ত্তিকবাবুর আদ্যশ্রাদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল।

ধনী কার্ত্তিকবাবুর শ্রাদ্ধ বেশ সমারোহের সহিতই সম্পন্ন হইবে। আমিই সে কর্ম্মের কর্ত্তা—আমিই সে উদ্যোগপর্ব্বের অধিনায়ক, যেহেতু কার্ত্তিকবাবুর স্ত্রী সন্ধ্যা আমার শ্যালিকা। তিনিই কার্ত্তিকবাবুর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। যদিও কার্ত্তিকবাবুর ভগিনী-ভাগিনেয় ও নিকট-আত্মীয় অনেক ছিল, তথাপি সন্ধ্যাই তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির একমাত্র স্বত্বাধিকারিণী হইয়াছিল। কারণ, তিনি বৃদ্ধ বলিয়া বিবাহের পূর্ব্বে সন্ধ্যার নামে সমস্ত সম্পত্তি দানপত্র লিখিয়া দিয়া তবে পাণি-গ্রহণের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সন্ধ্যার যখন সম্পত্তি, তখন আমার কর্ত্তৃত্ব ; ইহা বুঝিতে নিশ্চয়ই তোমাদের বাকী রহিল না !

শ্রাদ্ধের পর দিন—তখনও নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণের গোলযোগ শেষ হয় নাই, কেবল উঠিয়া লাগিয়াছে ! সকালে আমি চক্রাকারে ঘুরিয়া সকল কাজের বন্দোবস্ত করিয়া ফিরিতেছি ; এমন সময় অকালজলদোদয়বৎ, গৃহ-সুপ্ত-মানব-পার্শ্বে জ্বলন্ত অগ্নিবৎ কয়েকজন পুলিসের লোক আসিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেবের আদেশপত্র দেখাইয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিল। বলাবাহুল্য, তাহারা আমাকেই কার্ত্তিকবাবুর হত্যাপরাধী বিবেচনা করিয়াছিল। বাড়ীতে হৈ চৈ উঠিয়া পড়িল। আমার শ্বশুর-শাশুড়ী, আমার স্ত্রী, আমার পিতামাতা, আমার আত্মীয়-স্বজন সকলেই সেদিন সে বাড়ীতে নিমন্ত্রণোপলক্ষে আগমন করিয়াছিলেন—হঠাৎ আমার এই বিপদে তাঁহারা হাহাকার করিয়া উঠিলেন। সন্ধ্যাও "সুন্দর পড়েছে ধরা, শুনে বিদ্যা পড়ে ধরা, ধারা

বহে যুগল নয়নে” হইল। আত্মীয়-স্বজন,কুটুম্ব-কুটুম্বিনী সকলেই ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলেন। পুলিস আমাকে যথারীতি ধৃত করিয়া লইয়া গিয়া হাজতে পূরিল।

প্রায় পঞ্চদশ দিবস হাজত-সুখে অতিবাহিত করাইয়া একদিন আমাকে বিচারকের সম্মুখে বিচারার্থ হাজির করিয়া দিল। আমি দেখিলাম, আমার পিতা সাশ্রুনয়নে সেখানে উপস্থিত রহিয়াছেন। আরও চারি-পাঁচজন আত্মীয় আছেন এবং বিখ্যাত একজন ব্যারিষ্টার ও দুইজন উকীল আমার পক্ষসমর্থনার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন। কিন্তু আমার শ্বশুর আসেন নাই। কেন আসেন নাই, বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

সরকারপক্ষীয় উকীল বিচারকমহোদয়কে মোকদ্দমা বুঝাইয়া দিবার জন্য বলিতে লাগিলেন, “কার্ত্তিকচন্দ্র দে-চৌধুরী ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রায় বাইট বৎসর বয়সে সন্ধ্যা নাম্নী একটি যুবতীর পাণিগ্রহণ করেন, ইহা তাঁহার তৃতীয়পক্ষের বিবাহ। পূর্ব্বের দুই স্ত্রী পরপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। বৃদ্ধ বলিয়া তাঁহার তৃতীয়পক্ষের স্ত্রীর পিতা বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার সম্পত্তি কন্যার নামে দানপত্র লেখাইয়া লইয়া তবে বিবাহ দেন। মেয়েটি ক্রমে যৌবনের মধ্যভাগে উপনীত হয়। এরূপ অবস্থায় সচরাচর যাহা ঘটিয়া থাকে—তাহাই ঘটিয়াছিল, মেয়েটি চরিত্র বজায় রাখিতে পারে নাই। তাহার ছোট ভগিনীপতি—বর্ত্তমান মোকদ্দমার আসামী, মধুসূদনবাবুকে আত্মদান করেন। ক্রমে কথা সকলের কানে উঠে, তদবধি কার্ত্তিকবাবু স্ত্রীকে বাপেরবাড়ী যাইতে দেন না, মধুসূদনকেও তাঁহার বাড়ীতে আসিতে দেন নাই। ইহার ফলে যুবক-যুবতীর ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে এবং সেই ক্রোধ-বহ্নিতেই বৃদ্ধ কার্ত্তিক-পতঙ্গ বিদগ্ধ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট সাক্ষী-সাবুদ প্রদর্শন করিব এবং মধুসূদনবাবুর প্রদত্ত কার্ত্তিকবাবুর স্ত্রীর

নামীয় এমন কয়েকখানি পত্র আদালতকে দেখাইব, যদ্দ্বারা আসামীর অপরাধ সপ্রমাণ হইতে কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারিবে না।"

বিচারক একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া সরকারী উকীলের দিকে চাহিলেন। উকীলমহাশয় পেস্করবাবুর নিকট হইতে পুলিস-দাখিলি কাগজপত্র চাহিয়া লইয়া, তন্মধ্য হইতে তিনখানা পত্র বাহির করতঃ এক-একখানা করিয়া পাঠ করিলেন। আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

প্রথম পত্র

"সন্ধ্যা! তোমার পত্র পাইয়াছি;—তুমি কষ্ট পাইতেছ, ঠাকুরদার অত্যাচারে—ঠাকুরদার অবরোধ-যন্ত্রণায় ব্যথিত হইতেছ, কিন্তু কি করিব, হাত নাই। আমার মন ভাল নাই, এ জগতে তুমিই আমার হৃদয়ের ধ্রুবতারা! তোমার বিরহ আর সহ্য করিতে পারি না। মধু—"

দ্বিতীয় পত্র

"প্রাণের সন্ধ্যা;—এমন কাজ করিয়ো না। তুমি আত্মহত্যা করিলে আমাকেও সেই পথ অবলম্বন করিতে হইবে। শীঘ্রই যাহাতে সকল জ্বালার অবসান হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিতেছি।

ম:—"

তৃতীয় পত্র

"জীবন-সন্ধ্যা;—বৃথা প্রলোভনে তোমাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছি না। আমার হৃদয় যদি দেখাইতে পারিতাম, তবে জানিতে পারিতে, বুঝিতে পারিতে, আমি কি অবস্থায় দিন কাটাই-

তেছি। তোমার বিরহে আমি একরূপ উন্মাদ হইয়াছি। উন্মাদের কাজের পরিচয় শীঘ্রই পাইবে।

তোমার—মধু।"

পত্রগুলি শ্রবণ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব বলিলেন, "অপরিণামদর্শী যুবক-যুবতী অপবিত্র সম্মিলনে বাধা প্রাপ্ত হইলে যেমনভাবে পত্র লেখে, ইহাতে তাহার অধিক আর কি লিখিত হইয়াছে? দুই-এক স্থলে এই হত্যাকাণ্ডের আভাস বলিয়া ধরিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহার অপরদিক্‌ও ভাবিতে পারা যায়। হয় ত মেয়েটিকে কুলের বাহির করিয়া লইয়া যাইবার পরামর্শ করিয়াছিল, নয় ত কোন নিরাপদ গুপ্ত স্থানে দেখা-সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করিবে বলিয়া আশা দিয়া পত্র লিখিয়াছিল। হত্যাই যে করিবে, উহাতে এমন বুঝিবার বিশেষত্ব কি আছে?"

উকীল। না, তাহা নাই বটে; তবে এই পত্রগুলিতে যে আভাস পাওয়া যাইতেছে, সাক্ষিগণের বাচনিক প্রমাণে তাহা পরিস্ফুট হইবে।

আমাদের ব্যারিষ্টার উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, "ঐ পত্র তিনখানি প্রমাণস্বরূপে নথীর সহিত দাখিল থাকিতে পারে না। কারণ, উহা যে আসামী মধুবাবুর লেখা, অথবা কার্ত্তিকবাবুর স্ত্রীর নিকটে যে উহা পাওয়া গিয়াছে, পুলিস রিপোর্টে তাহা কিছুই ব্যক্ত নাই।"

ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব মনঃসংযোগসহকারে পুলিস-রিপোর্টখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন, তার পরে সরকারপক্ষীয় উকীলের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পত্র তিনখানা কোথায় এবং কিরূপ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল?"

উকীলবাবু একটু এদিক্‌-ওদিক্‌ করাতে মোকদ্দমাচালক একজন

পুলিসের লোক তাঁহার হাতে একখানা কাগজ দিল, তিনি তাহা পাঠ করিয়া বলিলেন, "কার্ত্তিকবাবুর বাড়ীর একটি দাসীর নিকটে।"

আমাদের ব্যারিষ্টার বলিলেন, "কাহারও অনুরোধ বা অপর কারণে একটা দাসী যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পারে না, কে বলিল ? কার্ত্তিকবাবুর অগাধ সম্পত্তি আছে ; তাঁহার স্ত্রীই সে সকলের অধিকারিণী—আর এই যুবক তাহার ভগিনীপতি—ইহার তত্ত্বাবধানে থাকিলে অনেকের লুণ্ঠনবৃত্তির তৃপ্তিসাধন হইবে না, ইত্যাদি ভাবিয়া জ্ঞাতিগণ অথবা যে বা যাহারা কার্ত্তিকবাবুর হন্তা, সে বা তাহারা যে, পুলিসের চক্ষুতে ধূলি দান করিতে ঐ সকল নবপন্থার সৃষ্টি করিতে পারে না, এমনই বা কে ভাবিতে পারে ?"

ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব প্রথমেই দাসীকে সাক্ষ্য দিবার জন্য তলব করিলেন।

আমি অধিক বলিতে পারিতেছি না—বড় কষ্ট হইতেছে। ফল কথা, দাসী সাক্ষ্য দিল, সন্ধ্যা সাক্ষ্য দিল, আরও চারি-পাঁচজন লোক সাক্ষ্য দিল। দাসী বলিল—"আমি ঘর পাইট করিবার সময় পত্রগুলি কুড়াইয়া পাইয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলাম। মধুসূদনবাবুতে আর আমাদের মনিবঠাকুরাণীতে অবৈধ-সম্বন্ধ কিছু আছে কি না, জানি না—এমন কথা কোন দিন শুনিও নাই। হাঁ, মধ্যে মধ্যে উভয়কে একত্রে কথোপকথন করিতে দেখিয়াছি।" সন্ধ্যা বলিল—"আসামী আমার ভগিনীপতি। আমাদের মধ্যে কোন দুষ্ট ভাব নাই। ছোট ভগিনীপতি, কাজেই ভালবাসি। আমাদের সমাজে ভগিনীপতির সহিত অন্যের অসাক্ষাতে হাসি-তামাসা করা চলে, আমার স্বামী তাহাতেই ঐরূপ মিথ্যা সন্দেহ করিয়া মধ্যে মধ্যে বকিতেন। কে খুন করিয়াছে, জানি না। কাহারও উপর আমার সন্দেহ করিবার কারণ বিদ্যমান নাই।"

অপর যাহারা সাক্ষ্য দিল, তাহারা পুলিসের সাক্ষাতে যেমন বলিয়াছিল, তেমন বলিল না—অনেক কথা পরিবর্ত্তন করিয়া বলিল। কে জানে, ইহারা কেন সে সকল কথা হজম করিয়া নূতন কথার অবতারণা করিল!

তার পরে উভয়পক্ষের উকীল-কৌন্সিলীতে বাদ-প্রতিবাদ ও বক্তৃতা হইল। সকল বিষয়—সকল কথা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করিয়া দিলেন। আমি অব্যাহতি পাইলাম।

পঞ্চম উল্লাস।

অঙ্কুর।

আমার অব্যাহতি লাভে আমার আত্মীয়-স্বজন, আমার বন্ধু-বান্ধব সকলেই আনন্দিত হইলেন। প্রতিবাসিগণ কিন্তু দুই-চারি কথা বলিতে ছাড়িল না। রণবিজয়ী বীরের ন্যায় আমি গর্ব্বিতপদক্ষেপে সে সকল অগ্রাহ্য করিয়া চলিলাম।

কয়দিন আমি বাড়ী গেলাম না। সন্ধ্যার আলয়েই অতিবাহিত করিয়া দিলাম। সপ্তাহখানেক পরে যেদিন বাড়ী গেলাম, সেদিন উষার সহিত সাক্ষাৎ হইল। কচি কলার পাতে আগুনের সেক দিলে তাহা যেমন ম্লান-বিবর্ণ হইয়া উঠে, হেমন্তের সান্ধ্যনলিনী যেমন বিশীর্ণ—হতশ্রী হইয়া যায়, উষাও তেমনি হইয়া গিয়াছে। আমার দর্শন পাইয়া কি একটা কথা বলিতে গিয়া একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল। কথা আর বলা হইল না। নীরবে অনেকক্ষণ কাঁদিল। আমি ভাল মানুষটির মত জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাঁদ কেন, কি হইয়াছে, বলই না ছাই!"

রোদন-লোহিত নয়ন দুইটী আমার মুখের উপর সংস্থাপন করিয়া কাতর-কম্পিতকণ্ঠে উষা বলিল, "মা দুর্গা যে মুখ তুলে চেয়েছেন, ইহাই আমার পূর্ব্বজন্মের সৌভাগ্য! তুমি আমার একটি কথা রাখিবে?"

তাহার তখনকার অবস্থা দেখিয়া বাস্তবিকই আমার বড় মায়া হইয়াছিল। সেই সদা চল চল—সদা চঞ্চল নয়ন দুইটী যেন স্থির হইয়া

গিয়াছে। রক্ত-রাগ-রঞ্জিত অধরে কালীর দাগ পড়িয়াছে। ফুল্ল-রক্ত-কুসুম-কান্তি গণ্ডযুগলে কালী ঢালিয়া দিয়াছে। এই কয়দিনে এত! আমি উষাকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,"তোমার কি কথা উষা?"

জলভরা পদ্ম প্রচাপিত হইলে যেমন তাহার সঞ্চিত জলটুকু ধারাকারে গড়াইয়া পড়ে, উষার পদ্মচক্ষু হইতে তেমনই জলধারা গড়াইয়া পড়িল। সে গলা ঝাড়িয়া বলিল, "যাতে লোকে নিন্দা করে, তা আর করিয়ো না।"

আমি। উষা, তুমি ক্ষুদ্র বালিকা;—বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিত একজন যুবককে হিতাহিত—সুনীতি-কুনীতি বিষয়ে উপদেশ দিবার অধিকার তোমার নাই।

উষা সে কথার কোন উত্তর করিল না। উদাস-স্থির-ভাস্বর নয়নের করুণ-দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

হায়! তখন কি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, ক্ষুদ্র বালিকার মধ্যেও অনন্ত জ্ঞান—বিরাট চৈতন্য অধিষ্ঠিত! বাহ্যিরের আবরণে আত্মা যত বিজড়িত, প্রকৃত জ্ঞান সেখানে তত অল্প। আমি মুগ্ধ, বাহিরের রূপে—কাম-কলুষে আত্ম-বিস্মৃত আমি—তখন ভাবি নাই, সেই ক্ষুদ্র বালিকার যতটুকু জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি আছে, আমার ততটুকুও নাই। ছিল;—আমি নিজে বাহিরের বাঁধনে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছি।

উষার করুণ-চাহনিতে প্রাণ যেন একটু বিচলিত হইল। মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার কি কথা বল?"

উষা আমার স্কন্ধোপরি তাহার অনিন্দ্যসুন্দর কচি মুখখানি গুঁজিয়া আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে কহিল,"আমি ছোট বলিয়া, মূর্খ বলিয়া, তুমি যদি আমার কথা শুনিবে না, তবে বলিয়া কি করিব?"

আমি। বলই না।

উষা। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আর দিদির বাড়ী যেও না।

আমি। কেন, তোমার দিদি কি?

উষা। কি, তা আমি জানি না। কিন্তু তুমি সেখানে কেন যাবে?

আমি। আমি তাহার কুটুম্ব—ভগিনীপতি; কেনই বা যাইব না?

উষা। পাঁচজনে যখন পাঁচ কথা বলিতেছে, তখন না যাওয়াই ভাল।

আমি। লোকে যদি অন্যায় করিয়া বলে?

উষা। লোকে যাতে নিন্দা করে, তা করিতে নাই।

আমি। মিথ্যা নিন্দার কোন মূল্য নাই। মিথ্যা সন্দেহ করিয়া পুলিস আমাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু দণ্ড দিতে পারিল কি?

উষা ধাঁ করিয়া আমার স্কন্ধ হইতে মুখ তুলিয়া লইল, ধাঁ করিয়া সরিয়া গিয়া দাঁড়াইল। দর্পণে হাই দিলে তাহা যেমন ঘামিয়া উঠে, উষা তেমনই ঘামিয়া উঠিল। ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে আর্ত্তস্বরে কহিল, "সাক্ষীর কথায়, আইনের চক্ষে যে বিচার,তা সত্যও মিথ্যা হয়, মিথ্যাও সত্য হয়ে যায়, কিন্তু যে চোখ জগৎ যুড়ে রয়েছে, যে কাণ বিশ্বব্যাপ্ত হ'য়ে আছে—সেখানে সত্য মিথ্যা হয় না, মিথ্যাও সত্য হয় না। সেখানেও বিচার আছে।"

ক্ষুদ্রতম বিষাক্ত অস্ত্রে প্রাণের ত্বক্ ভেদ করিল। আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। বসিয়া পড়িলাম। কেন জানি না, আমার এমন অবস্থা হইল। আইনে অব্যাহতি লাভ করিয়াছি, তবে আর ভাবনা কি? একটি ক্ষুদ্র বালিকার কথায়—কথাটা ত কিছুই নয়, এমন হইল কেন? ভগবানের বিচার? সে হয় ত মিথ্যা কথা। ভগবান কি আছেন? যদি থাকেন, পৃথিবীশুদ্ধ লোকের এত খুঁটিনাটির বিচার

করা তাঁহার সাধ্যাতীত। তথাপি কিন্তু প্রাণের কম্পন বিদূরিত হইল না। মনকে বুঝাইতে গিয়াও পারিলাম না। ঊষার উপরে বড় রাগ হইল, তখনই সেখান হইতে চলিয়া গেলাম।

ষষ্ঠ উল্লাস।

বায়ু।

সন্ধ্যার সঙ্গে তার পর হইতে আর বড় বিচ্ছেদ হয় নাই। সন্ধ্যার বাড়ীতেই উভয়ে বাস করিতে লাগিলাম। কার্ত্তিক ঠাকুরদার গাড়ী ঘুড়ীতে আমিই আরোহণ করিতাম, কার্ত্তিকঠাকুরদার দাসদাসী আমারই আজ্ঞা বহন করিত, কার্ত্তিকঠাকুরদার বিলাসভাণ্ডার আমারই বিলাস-ব্যসনে ব্যয়িত হইতে লাগিল। এক কথায় কার্ত্তিকঠাকুরদার যাহা কিছু ছিল, তৎসমস্তই তখন আমার হইয়াছিল। হয় ত তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছ না, কিন্তু সত্যই সব তখন আমার। আমি সন্ধ্যাকে দিয়া সে সকল আমার নামে লেখাইয়া লইয়াছিলাম। মোহ-মুগ্ধা পাপকার্য্যনিরতা একটী যুবতীকে ভুলাইয়া তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করা একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী ব্যক্তির পক্ষে তত সুকঠিন কার্য্য নহে। সন্ধ্যা তখন আমার সম্পূর্ণ পদানতা—তাহার রূপ-যৌবন, বিষয়-সম্পত্তি সমস্তই আমার চরণে উপঢৌকন দিয়া, আমারই মুখ চাহিয়া দিন কাটাইতে ছিল। কার্ত্তিক ঠাকুরদার আত্মীয়স্বজন ও পুরাতন দাসদাসী প্রভৃতি প্রায়ই সে বাড়ী হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। তবে যাহারা আমার ও সন্ধ্যার নিত্য তোষামোদ করিতে পারিত, তাহারাই সেখানে স্থান পাইয়াছিল।

সন্ধ্যাকে লইয়া সর্ব্বদা ক্রীড়াতৎপর থাকিতাম। সর্ব্বদা সাজ-সজ্জায় দিন কাটাইতাম। প্রেমের নাটক-নভেল পড়িতাম, থিয়েটারের দিন হইলেই থিয়েটারে যাইতাম। সন্ধ্যাসমাগমে গাড়ী হাঁকাইয়া

উভয়ে ইডেনগার্ডেনে ভ্রমণ করিতে যাইতাম। মধ্যে মধ্যে কার্ত্তিক ঠাকুরদার অতি সাধের সাজানো 'দমদমারবাগানে' গিয়া সন্ধ্যাতে আমোদে অতিবাহিত করিতাম। কোনদিন পুকুরে নামিয়া উভয়ে সাঁতার কাটিতাম। কোনদিন সে রাধার ভূমিকা লইয়া মান করিত, আমি কৃষ্ণ হইয়া তাহার পায়ে ধরিয়া মান ভাঙ্গিতাম। কোনদিন সে পুষ্পিত তরু-মাঝে বনদেবী সাজিয়া দাঁড়াইত। এ সকল ভূমিকার—এ সকল লীলা-খেলার—এ সকল ভাব-ভঙ্গীর প্রায়ই ফটোগ্রাফ তুলিতাম। আমার স্মরণ হয়, সন্ধ্যার বসন্তে বনদেবীর প্রতিকৃতিখানি স্থায়ী তৈলচিত্রে পরিণত করাইয়া দমদমার বাগানবাটিকার গৃহে টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিলাম। জানি না, এখনও তাহা বর্ত্তমান আছে কিনা? যাক্; ফল কথা, এইরূপ নানাপ্রকার প্রমোদলীলায় দিন অতিবাহিত হইতেছিল।

এ সকল বাহিরের সংবাদ তোমাদিগকে শুনাইলাম। কিন্তু মানুষ কি কেবল বাহির লইয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? বাহিরে ত সব মানুষই আপাতদৃষ্টিতে সমান—কিন্তু আন্তররাজ্যে কাহার কি কাণ্ড ঘটিতেছে, তাহা কি কেহ দেখিতে পায়? আমি বিবেচনা করি, বাহিরের সহিত মানুষের সম্বন্ধ যাহা, তাহা অন্তরদেশ লইয়া। আমরা নদীর উপরে তরঙ্গ দেখি, কিন্তু সে তরঙ্গ বাস্তবিক উপরের নহে, তরঙ্গ আগে নদীর তলদেশেই উঠিয়া থাকে। মানুষেরও আগে অন্তর হইতে তরঙ্গ উঠে—পরে তাহা বাহিরে আসে। তবে তাহার অনুভব করা যায় না, কেন না মানুষ সর্ব্বদাই তাহা চাপিয়া রাখিতে সচেষ্ট। আমার তখনকার অন্তর-তরঙ্গের ব্যাপারটা একটু শুনিয়া রাখ।

তোমরা বোধ হয়, স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছ যে, কার্ত্তিক ঠাকুরদার স্থূলদেহ হইতে তাঁহার আত্মার বা সূক্ষ্মদেহের বিয়োগসাধন আমার আয়োজনেই সম্পাদিত হইয়াছিল। আইনে আমাকে বাঁধিতে পারে

নাই, সমাজে আমাকে ধরিতে পারে নাই, কিন্তু উঁহার সেই 'ছোট কথাটি' যেন ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে বর্ণে বর্ণে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। একটি ক্ষুদ্র বীজ বপন কর, দুই-একদিনেই তাহা হইতে একটা প্রকাণ্ড গাছের চারা বাহির হইবে, ক্রমে তাহাই শত কাণ্ড-প্রকাণ্ডবিশিষ্ট মহী-রুহ হইয়া দিগন্ত যুড়িয়া বসিবে। বীজমধ্যে গাছটি অব্যক্ত অবস্থাতেই অবস্থান করিতেছিল, সময়ে প্রকাশ পাইল, এইমাত্র। নরহত্যার মহাপাতক—কার্ত্তিকঠাকুরদার ছিন্নকণ্ঠের শোণিত-বহ্নি আমার প্রাণ-স্পন্দনের প্রতি কম্পনে অব্যক্ত অবস্থায় জড়াইয়া গিয়াছিল; আমি বড় অধিক শান্তিতে বাস করিতেছিলাম না। বাহিরের লোকে ভাবিতে-ছিল, বড় পড়তা পড়িয়াছে—পরের অগাধ ধনে ধনী হইয়া বড় মজায় আছি। কিন্তু তা নয়; আমার প্রাণের মধ্যে কেমন একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব জ্বালা উপস্থিত হইল—একা থাকিলেই হৃদয়মধ্যে অনুতাপের বৃশ্চিকদংশন আরম্ভ হইত। কেন হইত, বলিতে পারি না। সে জ্বালা —সে রক্ত-দাহ দূর করিবার চেষ্টা করিতাম, কিন্তু কিছুতেই সাফল্য লাভে সক্ষম হইতাম না। তখন এক উপায় অবলম্বন করিলাম, সুরা সেবন আরম্ভ করিলাম। অর্থের অভাব ছিল না—ক্রমে আমি খুব একজন খ্যাতনামা সুরাপায়ী হইয়া উঠিলাম; তথাপি কিন্তু প্রাণের গোপনপুরে যে জ্বালা জ্বলিয়াছিল, যে দাগা লাগিয়াছিল, তাহা আর গেল না। ক্রমে আর এক উপসর্গ উপস্থিত হইল—আমি প্রায়ই কার্ত্তিকঠাকুরদার মূর্ত্তি মানস-চক্ষুর সমীপবর্ত্তী দেখিতে লাগিলাম, রাত্রিতে আমি তখন আর একা বাহির হইতে পারিতাম না;—আমার বোধ হইত, রাস্তার ধারে গৃহের ছাদে ছাদে কার্ত্তিকঠাকুরদা যেন তাহার ভীষণ প্রেতমূর্ত্তি লইয়া আমারই অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে!

তোমরা ভূত মান কি? ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এ পঞ্চ-

ভূতের কথা নয়। মানুষ মরিয়া যে ভূত হয় এবং সেই ভৌতিকজীবনে তাহার স্থূলদেহের ঘটনা মনে করিয়া কোন কার্য্য করিতে পারে কিনা। তখন অনেক লোককে এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। কেহ হাসিয়া উড়াইয়া দিত। কেহ কেহ বলিত, ভূত আছে। জীব তাহার পার্থিব দেহের অবশিষ্ট কার্য্যসাধন জন্য পৃথিবীর নিম্নস্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। আমি বি, এ, পাশ বাঙ্গালী যুবক, কাজেই ইংরেজের কথা আমার গুরুবাক্য। ইংরেজেরা এ সম্বন্ধে কি বলেন, তাহারই অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম। সেখানেও সেই এক তত্ত্ব! অনেক বৈজ্ঞানিক, অনেক গ্রন্থকার ভূত মানেন না, তাহার অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। অনেকে আত্মা আছে বলেন, কিন্তু জন্মান্তরাদি স্বীকার করেন না। অনেকে আবার আত্মা মানেন, জন্মান্তর মানেন, পরলোক মানেন, ভূত মানেন, ভৌতিকজীবনে জীবিতের উপর অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপও মানেন। কাজেই আমি সন্দেহের যে অন্ধকার লইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতানুসন্ধানে পরিলিপ্ত হইয়াছিলাম, সেই অন্ধকার লইয়াই ফিরিয়া পড়িলাম।

ভূত সম্বন্ধে সুমীমাংসা কিছুই হইল না বটে, কিন্তু আমার প্রাণের সেই নিদারুণ ভয় গেল না; বরং ক্রমেই তাহা ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমেই যেন আমার বোধ হইত, কার্ত্তিকঠাকুরদার প্রেতমূর্ত্তি প্রতিহিংসা সাধন করিবার জন্য—আমাকে সংহার করিবার জন্য—তাহার প্রেত-বাহু বিস্তার করিয়া বাতাসে বাতাসে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

সপ্তম উল্লাস।

আভাসিক তনু।

ইহার কিছুদিন পরে একজন জন্মান্তরবাদী পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়! মানুষ মরিয়া কি ভূত হয়?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "হয় বৈকি! যা যায়—তাই ভূত। গত হইলেই ভূত। অতীত হইলেই ভূত।

আমি। আপনার কথা বুঝিতে পারিলাম না।

পণ্ডিত। তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, মানুষ মরিলে ভূত হয় কি না। তদুত্তরে আমি বলিয়াছি—মরিলে সবই ভূত হয়। ভূত অর্থে গত। যে ছিল, সে নাই, কাজেই ভূত বা অতীত।

আমি। সেরূপ অর্থে আমি ভূত কথাটার প্রয়োগ করি নাই। ভূত বলিতে আমরা সাধারণতঃ এই বুঝি যে, মানুষ মরিয়া ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়, নরকের নিকটে—বৈতরিণীর কূলে কূলে কামনা-বাসনার দাগা লইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভ্রমণ করে। জীবিতকালে যে কাজ করিয়াছিল—যে পাপ করিয়াছিল, তাহার শাস্তিপ্রাপ্তি জন্য প্রেতের বিকট দেহ ধারণ করিয়া, কীটকুলের করালদংশনে কাতর হইয়া, গাছের ডালে, নদীর কূলে, লোকের গৃহের ছাদে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। তার পরে জীবিতাবস্থায় যাহার বা যাহাদের দ্বারায় অপকৃত হইয়াছে, প্রেত-দেহ প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে সন্ধান করিয়া ফিরে, সাক্ষাৎ পাইলে তাহার অনিষ্ট করে। শ্মশানের তটে সন্ধ্যাকালে এলোচুলে বসিয়া

প্রেতিনীকুল কাতরে পাপের শাস্তি ভোগ করে, আর প্রেতকুল বৃক্ষ-শাখায় বসিয়া হাহাকারে কৃতপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করিতে থাকে। এই-রূপ প্রেত-জীবন বাস্তবিক আছে কি না—তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। মানুষ মরিয়া এই প্রকার ভূত হয় কি না, তাহাই জানিতে ইচ্ছা করিতেছি।

পণ্ডিত। হয় বৈকি। কিন্তু সবাই হয় না। নিজ নিজ কর্ম্মফল অনুসারে কেহ কেহ ঊর্দ্ধগতিলাভ করিয়া স্বর্গলোকেরও উপরে চলিয়া যায়। তবে স্বর্গলোক, পিতৃলোক ও মর্ত্ত্যলোক (ভূঃ ভুব স্বঃ) এই তিন লোক লইয়াই সাধারণ জীবের গতাগতি।

আমি। কি প্রকার কর্ম্মফলে ভূত হয়?

পণ্ডিত। তা ঠিক বলা যায় না। তবে প্রবল পার্থিব আকর্ষণেই যে ভূত হয়; ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

আমি। ভূতযোনিতে ইচ্ছা করিলে পার্থিব প্রতিহিংসা কাহারও উপর সাধন করিতে সক্ষম হয় কি?

পণ্ডিতমহাশয় আমার মুখের দিকে একবার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহি-লেন। ঝটিতি যেন কি চিন্তা করিয়া লইয়া বলিলেন, "হাঁ, হয়।"

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। তবে পণ্ডিতমহাশয়কে আমার সে অবস্থা অবগত হইতে না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি পূর্ব্বে বলি-লেন—'প্রবল পার্থিব আকর্ষণেই মানুষ ভূত হয়,' কিন্তু যে কাহারও দ্বারা নিহত হইয়াছে, অথচ হয় ত তাহার তেমন পার্থিব আকর্ষণ কিছুই ছিল না, সেরূপ স্থলে বোধ হয়, ভূত না-ও হইতে পারে?"

পণ্ডিত। এ তত্ত্ব বুঝিতে হইলে প্রথমে গোড়ার একটা কথা শুনিতে হয়। এই যে বিরাট বিশ্বটা দেখা যাইতেছে, ইহা এক অখণ্ড বস্তুর অবভাসকমাত্র। মহাকাশকে যেমন ঘটপটাদির দ্বারা বিচ্ছিন্ন

জ্ঞান করা যায়, তদ্রূপ সেই এক অদ্বিতীয় আনন্দস্বরূপ আত্মাকে তোমার আত্মা, আমার আত্মা, তাহার আত্মা বলিয়া পৃথক্‌ জ্ঞান করা যায় মাত্র। বাস্তবিক আত্মা পৃথক্‌ও নহেন—জন্ম-মৃত্যুরও অধীন হয়েন না। তিনি নিহতও হন না, হত্যাও করেন না। এ সবই মায়ার খেলা। এখন মায়িককোষে আবদ্ধ সেই চৈতন্যের পৃথক্‌ বিকাশ আছে। আমাকে তুমি যদি খুন কর, বাস্তবিক তাহা আমাকে খুন করা হইবে না, আমার স্থূল দেহটাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইবে মাত্র। তখন আমার আত্মার সেই যে ভাবটুকু, সেই যে কর্ম্মটুকু, সেই যে সূক্ষ্ম শোণিতটুকু, তাহা তোমার আত্মাবরণের গায়ে গিয়া জড়াইয়া ধরিবে। জিনিষ যে এক। নদীর জলে চিনি ফেলিলে যতটুকু চিনি পড়ে, ততটুকুই মিষ্ট হয় না—যতখানিতে তাহার আবর্ত্ত যায়, ততখানি জল মিষ্ট হইয়া পড়ে। তখন তোমার আত্মাকে আমার আত্মা জড়াইয়া ধরিবার জন্য তাহার প্রেত-বাহু সৃজন করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। তোমার আত্মা আমার আত্মার আকর্ষণে চিনি-পড়া জলের মত মিষ্ট হইয়া যাইবে। ক্রমে ক্রমে জল চিনির আস্বাদে পূর্ণ হইবে, তোমার আত্মাও প্রেত হইয়া প্রেতলোক প্রাপ্ত হইবে।

আমার হৃৎপিণ্ডটা বড় দ্রুতভাবে কাঁপিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহা কি সত্য হইতে পারে ?"

পণ্ডিতমহাশয় মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সত্য হইবে না কেন ? কর্ম্ম-শক্তি কি ব্যর্থ হইবার ? একটা গল্প বলি, শোন। সুরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি শত্রুকর্ত্তৃক হৃতরাজ্য ও হৃতবল হইয়া একাকী গহনকাননে প্রবেশ করেন। তথায় মেধস্‌ মুনির সহিত সাক্ষাৎ হয়। মুনির নিকট রাজা মহামায়ার কাহিনী শ্রবণ ও তত্ত্বোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া শক্তিসাধনা করেন। তিনিই প্রথমে দুর্গোৎসব

করেন। দুর্গোৎসবে লক্ষ বলি প্রদান করেন। এক লক্ষ ছাগ—মেষ—মহিষের ছিন্ন কণ্ঠের রুধির-ধারায় শক্তির উদ্বোধন করেন। সেই শক্তি-সাধনার ফলে—সেই পশু-মেধ যজ্ঞের বলে—সেই দুর্গোৎসবের মহামহিমায় সুরথ রাজা মহিমান্বিত হইয়া শত্রুনিধনপূর্ব্বক অপহৃত রাজ্য পুনর্ব্বার গ্রহণ করিলেন ;—ইহলোকে নানাবিধ সুখভোগ করিয়া অন্তে স্বর্গে গমন করিলেন। কিন্তু স্বর্গের পথ তাঁহার পক্ষে নিরাপদ হইল না, সেই লক্ষ পশুর আত্মা লক্ষ খড়্গ তাঁহার কণ্ঠোপরি তুলিয়া ধরিল। তুমি আমি ভাবিয়া থাকি, প্রতারণা করিয়া লোক ঠকাইলাম—কর্কশ অপ্রিয় ভাষায় লোকের প্রাণে ব্যথা দিলাম, পরস্বাপহরণ করিলাম—মনে ভাবিলাম, আমি বেশ ; কেহ আমার কিছু করিতে পারিল না। কিন্তু আত্মা সাক্ষীস্বরূপ—তিনি কিছু বিস্মৃত হইবার নহেন। রক্তজবার পার্শ্বস্থ স্ফটিক যেমন রক্তজবার বর্ণ ধারণ করে, তেমনি আত্মার কোষগুলি আসক্তির দাগে অনুরঞ্জিত হইয়া যায়। তখন আত্মা তদ্ভাবাপন্ন হইয়া পড়েন। তেলাপোকাকে কাচপোকা হইতে দেখিয়াছ ? সেও ঐ কারণে হইয়া থাকে। ভাবিতে ভাবিতে জীব ভাব্য পদার্থের স্বারূপ্য লাভ করে।

পণ্ডিতমহাশয়ের কথা তখন ভাল রূপ বুঝিতে পারিলাম না। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় হইলাম।

গঙ্গাতীরের রাস্তা ধরিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলাম। আমার গাড়ীখানা হন্ হন্ করিয়া ছুটিতেছিল। সহসা আমার যেন বোধ হইল, আমার গাড়ীর দুরোজার নিকট দিয়া একখানা রক্তাক্ত ছুরি হাতে লইয়া সাঁ করিয়া কার্ত্তিকঠাকুরদা চলিয়া গেল। চীৎকার করিয়া গাড়ী রাখিতে আদেশ করিলাম। গাড়ী দাঁড়াইল ;—সাহসে ভর করিয়া যেদিকে কার্ত্তিকঠাকুরদা গিয়াছিল, সেইদিকে চাহিলাম—কোথাও কেহ নাই!

অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া যখন কিছুই দেখিতে পাইলাম না, তখন ভাবিলাম, নিশ্চয়ই আমার মনের এবং চক্ষুর বিকৃতি! কোচয়ানকে গাড়ী হাঁকাইতে হুকুম করিলাম।

আবার! আবার সেই মূর্ত্তি! এবার নিকটে নহে, দূরে! গঙ্গা-গর্ভে; পূর্ণচন্দ্রের রজত-কিরণাপ্লুত ক্ষুব্ধ স্ফীত সঞ্চালিত উত্তাল তরঙ্গমালা-সঙ্কুল গঙ্গার জলরাশির উপরে কার্ত্তিকঠাকুরদা! হস্তে সেই শোণিতাক্ত ভীষণ ছুরিকা! আমার দিকে তীব্র চাহনিতে চাহিতেছিল। সে যে কি ভীষণ চাহনি—কি করিয়া বলিব, তাহা কত বাজের আগুনে মাখান! আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছিলাম, কিন্তু গাড়ী ছুটিয়া পূর্ব্বদিকের রাস্তা বহিয়া চলিয়া গেল, সে মূর্ত্তি দৃষ্টির বহির্ভূত হইল।

তোমরা হয় ত বলিবে, সে মূর্ত্তি কার্ত্তিকঠাকুরদার আভাসিক মূর্ত্তি। তাই বটে—কিন্তু তাহার আত্মা এ মূর্ত্তি ধরে নাই। আমারই জীবাত্মা তাহার কর্ম্মফলে প্রেতলোকে যাইবার জন্য ক্রমে তদাকার প্রাপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। পাপে যে অনুতাপ আসে—চিন্তা আসে, সেই অনুতাপ—সেই চিন্তা, সেইরূপ ভাব-ব্যূহ রচনা করিতে থাকে। কুকর্ম্মফলে নরক গঠন করে।

অষ্টম উল্লাস।

উষা।

কর্পূর-কুন্দ-ধবল-জ্যোৎস্না-পুলকিতা যামিনীতে আমি ও উষা ছাদের উপর বেড়াইতেছিলাম। কথায় কথায় উষা বলিল, "তুমি দিন দিন এত ম্লান হইয়া যাইতেছ কেন ?"

আমি সহসা সে কথার কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন উত্তর পাইল না, তখন উষা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কোন অসুখ করে নাই ত ?"

আমি। না, না, কোন অসুখ নাই।

উষা। তবে দিন দিন শরীর অমন কালী হইয়া যাইতেছে কেন ? আয়না ধরিয়া দেখিয়ো—শরীরে আর কিছু নাই। এমন কেন হ'লে ?

আমি। এমন কেন হইলাম, তাহা বলিতে পারি না উষা ;— বোধ হয় আমাকে ভূতে পাইয়াছে।

উষার রক্তাধরে হাসি ফুটিল। সে হাসি বৃষ্টির পরে মন্দ বিদ্যুতের সহিত উপমেয়। বলিল, ভূতেই পাইয়াছে বটে, নতুবা মানুষের যাহা করিতে নাই, তুমি তাহা করিবে কেন ?"

আমি। আমি কি করিতেছি ?

হাসির ধারে অশ্রু আসিল। বর্ষণলঘু মেঘ বিদ্যুতের পরে আবার কয়েকবিন্দু জল ঢালিয়া দিল। আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে উষা বলিল, "তুমি ভদ্র সন্তান, সুশিক্ষিত, তুমি মদ খাবে কেন !"

আমি। অনেক উচ্চ শিক্ষিতেও মদ খায়।

উষা। যারা খায়, তারা বুঝি তোমারই মত অনুতাপ-তপ্ত। তুমি পারদারিক।

আমার বড় রাগ হইল। ছোট মুখে বড় কথা! ক্রুদ্ধস্বরে বলিলাম, "উষা, একটা কথা বলিব ?"

উষা। বল।

আমি। তুমি স্ত্রী, আমি স্বামী—

উষা। হিন্দুর মেয়ে সে সম্বন্ধ উত্তমরূপেই বুঝিয়া রাখে।

আমি। আমার উপরে তোমার কোন কথা বলিবার অধিকার নাই।

উষা। আছে না আছে, জানি না। তুমি আমায় শিখাও নাই। শিখাইবার অবকাশ পাও নাই বলিয়া হয় ত শিখাও নাই। বিবাহ হইতেই দিদিকে ভালবাসিয়াছ, দিদিকে লইয়া পাগল হইয়াছ, অভাগী উষার দিকে একবারও ফিরিয়া চাও নাই—উপদেশ দিবে কেমন করিয়া ? কিন্তু হিন্দুর মেয়ে আপনি বুঝিয়া লইতে পারে, স্বামি-দেবতা সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ। হিন্দুর মেয়ে জানে, সে দেবতার সেবা করিতে হয়—নিত্য ধুইয়া মুছিয়া ভোগ-রাগ দিতে হয়—আঁচলে বাতাস করিতে হয়। দেবতাকে সিংহাসনে তুলিয়া রাখিতে হয়। গায়ে ময়লা জন্মিলে ঘসিয়া মাজিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। আমি হতভাগী—আমারই জন্ম-জন্মের কৃত মহাপাতকের ফলে আমার দেবতার প্রাণে ময়লা জন্মিয়াছে ; বড় ইচ্ছা করে, প্রাণের বিনিময়ে তাহা পরিষ্কার করিয়া দিই। কিন্তু আমি ক্ষুদ্র—আমার শক্তি ক্ষুদ্র—সাধনা ক্ষুদ্র। পারি না, শক্তিতে কুলায় না তাই কাঁদিয়া মরি।

আমি অধিকতর বিরক্ত হইলাম। উষার মুখে অত কথা শুনিতে

আমার ভাল লাগে না। আমার ইচ্ছা, সে নীরবে আমার সেবা করিবে, নীরবে আমার আজ্ঞা পালন করিবে। আমার কথায় বা কার্য্যে সে বাদ-প্রতিবাদ করিতে পাইবে না। তাহাতে তাহার অধিকার কি?

উষা কিন্তু ছাড়িল না। সে হঠাৎ আমার পায়ের তলে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে আমার দুই পা জড়াইয়া ধরিল। দুই চক্ষুর জলে আমার দুই পা ভাসাইয়া তুলিল। আমি অধিকতর বিরক্ত হইলাম। বলিলাম, "জ্বালিয়ে মার্‌লে, বল না ছাই—তোমার কথা কি!"

কাঁদিতে কাঁদিতে—ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে উষা বলিল, "আমার কথা আর কিছু নয়, একটি প্রার্থনা—তুমি কেমন হইয়া যাইতেছ। মনে তোমার চিত্তবিকৃতি উপস্থিত হইয়াছে, তোমার গায়ের রঙে কালী ঢালিয়া দিয়াছে, কপালের শিরা বাহির হইয়া পড়িয়াছে—আহার কমিয়া গিয়াছে—তুমি ওসকল কাজ আর করিয়ো না। লোকেও বড় নিন্দা করিতেছে।"

আমি গম্ভীর-ক্রুদ্ধস্বরে বলিলাম, "তোমার কাছে আমি উপদেশ চাহি না। সন্ধ্যাকে পরিত্যাগ করিলে আমার গুষ্টিশুদ্ধ অন্নাভাবে শুকাইয়া মরিবে।"

ধাঁ করিয়া পা ছাড়িয়া দিয়া উষা উঠিয়া দাঁড়াইল। ম্লান অথচ রক্ত-রাগ-রঞ্জিত মুখখানা ঈষদুত্তোলন করিয়া স্থির নয়নের স্থির অচঞ্চল উদাসদৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে মুখ তখন যেন কেমন উদাস-উত্তেজনা, বোধন-বিসর্জ্জনের অপূর্ব্ব ভাবে পরিপূর্ণ দেখাইতেছিল;—যেন অস্তগামী সূর্য্যের একটু ক্ষীণ হেম-কিরণ নবাগতা সন্ধ্যার আবিল অন্ধকারে মিশিয়া নদীর স্বচ্ছ নীল জলে একত্রে পড়িয়া এক অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়াছিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া উষা গলা

ঝাড়িল। তথাপি কিন্তু তাহার গলার স্বর পরিষ্কার হইল না। রুদ্ধস্বরে বলিল, "কেন? শুকাইয়া মরিবে কেন? আমার স্বামী কি মূর্খ? কত মূর্খ স্বামীর স্ত্রী আত্মীয়-পরিজন লইয়া সুখে দিন কাটাইতেছে, আর আমরা ভাত পাইব না! সন্ধ্যার টাকায় আমাদের প্রয়োজন কি?"

আমি। লেখাপড়া জানিলেই আজকাল চাকুরী হয় না। বিশেষতঃ অত টাকা কোথা হইতে আসিবে?

উষা। অত টাকায় আমাদের প্রয়োজন নাই। না হয়, এক বেলা খাইব। শান্তির একমুঠা ভাতও ভাল। পুণ্যের উপবাসেও গায়ের রক্ত বৃদ্ধি পায়। পাপের অতুল-ঐশ্বর্য্যও রৌরবের বিপুল বাঁধন!

রৌরব! নরক! আমার প্রাণের মধ্যে কেমন এক একটা রক্ত-বিদ্যুৎ বহিয়া গেল। আমি উষার সহিত আর কথা কহিলাম না। সে স্থান হইতে দ্রুতপদে নীচে নামিলাম এবং একেবারে রাস্তায় বাহির হইয়া সন্ধ্যার বাড়ী অভিমুখে চলিয়া গেলাম।

নবম উল্লাস।

নিশ্বাস।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। অনেক কথাই ভুল হইয়া যাইতেছে, ঠিক গুছাইয়া বলিতে'ও পারিতেছি না। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, সেই সকল অতীত কথা—সেই সকল লজ্জার কথা—পাপের কথা—আত্মকৃত দুষ্কৃতির কথা বলিতে আমার লজ্জা হইতেছে—তাই কষ্ট হইতেছে, তাহা নহে। এমন শত জন্মের কথা—শত জন্মের আত্মকৃতকর্ম্মের কথা—আত্মীয়-স্বজনের কথা, আমার এখন মনে পড়িতেছে। এখন কিছুতেই মায়া নাই, লজ্জা নাই, আছে কর্ম্মের সংস্কার, আর সংস্কারের জ্বালা। আমার কষ্ট হইতেছে অন্য কারণে—সে কারণ তোমরা বুঝিবে না।

আমি যে কথা বলিতে ভুলিয়াছি, তাহার মধ্যে একটা কথা না বলিলে, আমার আর সব কথা ভাল করিয়া বুঝিতে তোমাদের একটু গোল হইতে পারে।

সন্ধ্যার সহিত মিলন ও কার্ত্তিকঠাকুরদার পরলোকপ্রাপ্তির পর প্রায় পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে সন্ধ্যাকে তাহার পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন অনেক বুঝাইয়াছিল, অনেক শাসনবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, কিন্তু সে নিবৃত্ত হয় নাই। তার পর তাহার আত্মীয়-স্বজন—তাহার পিতামাতা তাহার সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের বাড়ী যাইবার অধিকারও তাহার ছিল না।

আমি যখন সন্ধ্যার বাড়ী উপস্থিত হইলাম, তখন সে কুসুম ভূষণে

ভূষিত হইয়া তাহার আনিতম্ববিলম্বিত সুগন্ধিম্রক্ষিত চুলের রাশি ছড়াইয়া দিয়া একখানা শোফার উপরে শুইয়াছিল। উপরে সুদৃশ্য কাচাধারে উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছিল—নিম্নে অপ্সরা-রূপের জ্বলন্ত আলোক উথলিয়া উঠিতেছিল। তোমরা বলিবে—বিধবার এত ব্যসন কেন? কিন্তু বুঝিলে না, সে যে পাপের পথে পা দিয়াছে। যে এক প্রকার পাপ করে, শতপ্রকার মহাপাতক আসিয়া তাহার সমস্ত আত্মিক অঙ্গে চাপিয়া বসে। বস্ত্রের এক স্থানে ছিন্ন হইলে সর্ব্বত্র না হইয়া যায় না। এক কলসী দুগ্ধের এক স্থানে বিন্দুপরিমাণে অম্লরস প্রদান করিলে সবখানি দুধ জমিয়া অম্ল হইয়া যায়।

আমি উপস্থিত হইলে সন্ধ্যা কথা কহিল না। বুঝিলাম, সে কোন বিষয়ে চিন্তা করিতেছে। আমারও মনটা তখন ভাল ছিল না। তেমন বুঝি আদর-সোহাগে কথা কহিতে পারিলাম না। আরও কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তার পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সন্ধ্যা, চুপ করিয়া রহিলে যে? কথা কহিতেছ না কেন?"

সন্ধ্যা সোফার উপরে একটু উঁচু হইয়া উঠিয়া বলিল, "কাহার সহিত কথা কহিব? তোমার সহিত? তুমি আমার কে? ভগিনীপতি। কিন্তু ভুল করিয়াছিলাম, তোমাকে জীবন-সর্ব্বস্ব ভাবিয়াছিলাম! ধর্ম্ম-কর্ম্ম-জীবন-যৌবন সব দিয়াছিলাম। আর—আর; মহাপাপ করিয়াছি! তোমার প্ররোচনায়—দুর্দ্দমনীয় রিপুর প্ররোচনায়—যাহা করিতে নাই, তাহাই করিয়াছি। স্বামীহত্যার সাহায্য করিয়াছি। তার পর সমস্ত বিষয়-আশয় তোমাকে লিখিয়া দিয়া এখন তোমায় করুণা-ভিখারিণী হইয়াছি। কাজেই তুমি আমাকে পায়ে ঠেলিবে বৈকি!"

আমি। কেন ও সকল কথা, সন্ধ্যা? আমি কি কোন দিন তোমাকে অনাদর করিয়াছি?

সন্ধ্যা ভ্রূ-ভঙ্গী করিয়া বলিল, "তোমার আদর আমি চাহি না। মনে তোমার ঊষা—শুধু মুখের কথায় আমাকে ভুলাইয়া রাখা।"

আমি বড়ই ক্ষুণ্ণ হইলাম। বলিলাম, "তবে কি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে বল?"

সন্ধ্যা। কেন বলিব? আমি কিন্তু তোমার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছি—তোমাকে সব দিয়াছি।

আমি। যদি বল—তাহাতেও প্রস্তুত আছি।

সন্ধ্যা। মিছে কথা।

আমি। না সন্ধ্যা, সত্য বলিতেছি।

সন্ধ্যা। যদি সত্য বলিয়া থাক, তবে আর তাহার নিকটে যাইতে পারিবে না।

আমি। তাহাদের গতি?

সন্ধ্যা। টাকা পাঠাইয়া দিয়ো।

আমি। ঊষা তোমার ছোটভগিনী।

সন্ধ্যার চক্ষুর্দ্বয় যেন জ্বলিয়া উঠিল। সে আরও একটু উন্নতমুখী হইয়া গম্ভীর-তীক্ষ্ণকণ্ঠে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিল, "যে রিপুর পদতলে স্বামীর কণ্ঠ-রক্ত নিবেদন করিতে পারে,—কুবেরের ভাণ্ডার উৎসর্গ করিতে পারে, জাতি-কুল ইহ-পরকাল বলি দিতে পারে—তার কাছে ছোটভগিনী! যাও তুমি সেখানে যাও, আর আসিয়ো না। আমার সর্ব্বস্ব লইয়া যাও—আর আসিয়ো না। আমি পথের ভিখারিণী হইয়াছি;—সমাজে ঘৃণিতা কলঙ্কিনী হইয়াছি, নিজের মনের নিকটেও বুঝি অবিশ্বাসিনী হইয়াছি। আমি আমার কাজের প্রতিফল ভোগ করিতে থাকি।"

আমি কি উত্তর করিব, বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। সন্ধ্যার

অদূরে একখানা চৌকী ছিল, তাহাতে বসিয়া পড়িলাম। একটা ভৃত্যকে ডাকিয়া মদের বোতল আনিতে বলিলাম। সন্ধ্যা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিরক্তিভাবে নিষেধ করিল, ভৃত্যটা ভয় পাইয়া বোতল না আনিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। তখন আমি নিজে গিয়া বোতল আনিলাম এবং গ্ল্যাসে মদ ঢালিয়া সন্ধ্যাকে খাইবার জন্য অনুরোধ করিলাম। সন্ধ্যা খুব মদ খাইতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু সেদিন কিছুতেই খাইল না। তখন বিরক্ত হইয়া আমি অনেকখানি মদ্য উদরস্থ করিলাম। মাথা টলিতে লাগিল। হঠাৎ বমন হইল। দেখিলাম, সেই বমনের পদার্থ আর কিছুই নহে—রক্ত! রক্ত বমন কেন হইল? ভীত-চকিত নেত্রে সন্ধ্যার দিকে চাহিলাম।

উঃ! কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! সে দৃশ্যের কথা মনে হইলে এখনও প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। সন্ধ্যার ঠিক পশ্চাদ্ভাগে কার্ত্তিকঠাকুরদা রক্তাক্ত ছোরা হাতে করিয়া তাহার প্রেত-কঙ্কাল বাহু বিস্তৃত ও আন্দোলিত করতঃ যেন আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে। তাহার কোটরগত চক্ষুর চাহনি কি ভীষণ! মৃত্যুগন্ধী নিশ্বাস আসিয়া আমার বক্ষঃস্থলে অগ্নি বর্ষণ করিল—আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলাম।

দশম উল্লাস।

গান।

আমায় রোগে ধরিল, শয্যা গ্রহণ করিলাম। ডাক্তারগণ পরীক্ষা করিয়া বলিয়া দিলেন, 'যকৃতের ক্রিয়া-বিশৃঙ্খলায় ব্যাধি জন্মিয়াছে। যকৃৎ খারাপ হইয়াছে—সবিশেষ সুচিকিৎসায় আরোগ্যের আশা করা যাইতে পারে।' চিকিৎসার কোন ত্রুটি হইল না, তিন-চারি মাস ধরিয়া কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু বিশেষ কিছুই উপকার হইল না।

ক্রমে আমি জীর্ণ হইতে লাগিলাম। উঠিতে গেলে মাথা টলিয়া পড়িত, ক্ষুধামাত্র ছিল না, আহারের নামও স্মরণ করিতে ভয় হইত। জগতের কিছুই ভাল লাগিত না,—যাহার রূপের মোহে ইহ-পরকালের কথা মুহূর্ত্তের জন্যও স্মরণ করিবার অবকাশ পাই নাই, সে কাছে আসিলে যেন যম-যন্ত্রণা উপস্থিত হইত! সন্ধ্যা নিকটে আসিলেই যেন কার্ত্তিকঠাকুরদা তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিত। সন্ধ্যাকে মোটেই ভাল লাগিত না। তাহাকে দেখিলে ইহকাল মনে পড়িত, পরকাল মনে পড়িত; আর অনুতাপের তপ্ত ব্যথা যেন হৃদয় হইতে উঠিয়া আমার সমস্ত দেহকে আচ্ছন্ন-প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত; সে ব্যথার করুণদাহে আমার আত্মা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িত। তবে এ ব্যথা কেবল যে সন্ধ্যাকে দেখিলেই হইত; তাহা নহে। ইহা এখন আমার নিত্য সঙ্গী। এ ব্যথার বিষাণরব আমার কাণে সর্ব্বদাই ধ্বনিত হইত। এ ব্যথা আমার কলুষ-ক্লিষ্ট আত্মার আত্মহারা রোদন। এ ব্যথা আত্মার উপর রক্ত-

মাংসের বিপুল দংশন। তবে সন্ধ্যা নিকটে আসিলে, অথবা সময়ে সময়ে যাতনা বৃদ্ধি পাইত মাত্র।

এই অবস্থায়—এক-একবার মনে হইত, ভগবানের দয়াল নাম গ্রহণ করি, তাঁহার শান্তিময় নামের বলে অশান্ত জীবনে শান্তি আসিতে পারে। চেষ্টা করিতাম, হইত না। প্রাণে তাহার স্থান ছিল না। ভগবানের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাসই আসিত না। বর্ষণলঘু মেঘের মত সে ভাব অল্পক্ষণেই হৃদয়াকাশ হইতে উড়িয়া যাইত। এতদিন যে সকল কাজ করিয়াছি, সেই সকল কাজের একান্ত চিন্তাই যেন প্রাণে একটু শান্তি দিত। কল্পনার বলে গাড়ী-যুড়ী কামিনী-কাঞ্চন নেশা-ব্যসন এই সকলের নূতন নূতন সংস্করণ মনের মধ্যে গড়াইয়া লইয়া তাহারই চিন্তা করিতে ভাল লাগিত। ক্ষুধার্ত্ত কুক্কুর যেমন শুষ্ক অস্থি চর্ব্বণ করিতে করিতে তাহারই দন্তমূল বিগলিত শোণিত-ধারায় তৃপ্তি বোধ করে, আমিও তদ্রূপ আত্মকৃত কুকর্ম্মরাশির সংস্কারবিগলিত কল্পনা লইয়া তৃপ্তি বোধ করিতাম।

মানুষ ভাবে, এখন আমার নূতন বয়স, নূতন জীবন—এখন শুষ্ক ধর্ম্মের চর্চ্চা করিব কেন; জরা আসুক, তখন সে সকল হইবে। কিন্তু তা' হয় না। আমার জীবন দিয়া আমি তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। মনে হইত, ভগবানের চিন্তা করি, কিন্তু সাধ্য কি? তাহা প্রাণে স্থানই পাইত না। আগে যে সকল কাজ করিয়াছি, তাহার সংস্কার মনের সকল জায়গায় দাগমারা হইয়া গিয়াছে, সেই সংস্কার এখন চিন্তনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

যাক্, যাহা তোমরা শুনিতে চাহিতেছ, তাহাই বলি।

তখন আমি বাড়ী আসিয়াছি। বাড়ীই থাকিতাম। সন্ধ্যা দুই-এক-দিন অন্তর আসিয়া আমাকে দেখিয়া যাইত।

সেদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমি আমাদের বাড়ীর দরোজার সম্মুখে বসিয়া একটি কল্পনা-লোক-বাসিনী কামিনীর রূপ লইয়া চিন্তা করিতে-ছিলাম—হাব-ভাব-কটাক্ষে মজিয়াছিলাম, এমন সময়ে এক ভিখারিণী আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার দিকে একবার তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "দাদাবাবুর শরীর যে একেবারে গ'লে গেছে দেখ্‌ছি। তোমার কি অসুখ গা?"

ভিখারিণীর সহিত আমার কখনও পরিচয় নাই। তবে মধ্যে মধ্যে তাহাকে ভিক্ষা করিতে আসিতে দেখিয়াছি মাত্র। তাহার আগমনে আমার কল্পনা-সুন্দরী অন্তর্হিতা হইল, কাজেই মাগীটার উপর ভারী রাগ হইল। তাহাকে ধমক দিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু সে ততক্ষণ আমাদের বাড়ীর মধ্যে প্রাঙ্গণে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। আমাকে প্রশ্ন করিয়া তাহার উত্তরের অপেক্ষা করে নাই, বোধ হয়, তত সময় নষ্ট করা তাহার পক্ষে অনাবশ্যক বোধ হইয়াছিল। ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলের উপরে তাহার যত অনুরাগ, আমার ব্যাধির বিবরণ শ্রবণে অবশ্যই তত নহে।

প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া ভিখারিণী দীর্ঘস্বরে ডাকিল, "মা ঠাকরুণ গো, ভিক্ষা দাও। কেউ গান শুন্‌বে না?"

কেহই কোন উত্তর করিল না। ভিখারিণী কিন্তু গান গাহিতে নিরস্ত থাকিল না। সে গান ধরিল!

গান কি হৃদয়বিদারক! মনের মধ্যে যে সকল স্মৃতি ভস্মাচ্ছাদিত আগুনের মত পড়িয়া থাকে, তাহাকে একেবারে জ্বালাইয়া দেয়। নব-বসন্তের অবসানোন্মুখ দিবসে যখন ভিখারিণীর কণ্ঠ হইতে উচ্চৈঃস্বরে গান গীত হইতে লাগিল, তখন তাহার ভাব কি মর্ম্মভেদী হইয়াছিল, তোমরা তাহা হয় ত বুঝিতেই পারিবে না।

ভিখারিণী গাহিতেছিল—

"সাধের ঘুম-ঘোর কভু কি ভাঙ্গিবে না।
কাল বিছানায় শুয়ে, আশার চাদর ঢাকা
কতদিন গেল কেটে, বিবেক-রজক-ঘরে
তারে ধুয়ে লও না॥
বিষয়-মদ খেয়ে, আছ তুমি মাতাল হ'য়ে
সে মদের ঘোর কি কভু ভাঙ্গিবে না॥
কোলে করি আছ শুয়ে, কামনা-স্বরূপা মেয়ে,
তারে ছেড়ে একবার পাশ ফির না।
কি ছার ঘুমখানি, যতনে সেধেছ তুমি,
সুখের রজনী কি রে কভু ভোর হবে না॥
কিন্তু এ ঘুমঘোরে, মহা ঘুম ঘেরিবে তোরে,
ডাকিলে চেতনা সেদিন আর ত মিলিবে না।
তখন প্রাণের বাছাগুলি, প্রিয়াও আকুল বুলি,
ডেকে ডেকে আর তোমায় জাগাতে পারিবে না।
এখন ফিরে যাবার বেলা হ'ল, আর কেন ঘুমাও বল,
সময় থাকিতে কেন হরি হরি বল না॥"

গানটি পুরাতন, সবাই জানে, আমিও কতবার শুনিয়াছি, তথাপি গানের প্রত্যেক কথাগুলি যেন বিষমাখান তীক্ষ্ণধার সূক্ষ্ম ছুরিকার ন্যায় আমার মর্ম্মত্বক্ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। সেই থিয়েটারের দিন হইতে আর আজ পর্য্যন্ত যেন একখানি আলেখ্য হইয়া আমার মনশ্চক্ষুতে পতিত হইল। মুহূর্ত্তে মনে হইল, মানুষ এতটুকু! তাহার কাজ এতটুকু! পার্থিব হিসাবে—কালের গণনায় কয়েক বৎসর হইবে, কিন্তু মনে করিয়া দেখিলে সেইদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত কয় মুহূর্ত্তের কার্য্য! অল্পক্ষণ—অতি অল্পক্ষণ! এই অল্পক্ষণের জন্য মানুষ কত পাপ করে।

ব্যাধি আর সারিল না—ঐ শকুনীর মত আমাকেও উড়িয়া উড়িয়া ঊর্দ্ধে যাইতে হইবে।

মনে হইল, তাতে ক্ষতি কি? সংসারেই বা সুখ কি! আত্ম-গ্লানিতে হৃদয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে—বাঁচিয়া লাভ কি! কাত্তিকঠাকুরদার প্রেত-মূর্ত্তি আমাকে যেরূপভাবে তাড়াইয়া ফিরিতেছে, তাহাতে মরণই মঙ্গল।

কিন্তু! কিন্তু আবার কি? ঊষা,—আমার অভাবে ঊষা বড় কষ্ট পাইবে! চিরাচরিত অভ্যাসমত ঊষাকে কাল রাত্রে যখন অকথ্য ভাষায় গালি দিয়াছিলাম, তখন তাহার যে দৃষ্টি দর্শন করিয়াছিলাম, হায়! তেমন আর কখনও দেখি নাই। মরি মরি, সে দৃষ্টি কি করুণ-কাতরতায় পূর্ণ। অনশনখিন্ন, প্রহৃত, পালিত কুকুর যেমন প্রভুকে দেখিয়া সস্নেহ কাতরদৃষ্টিতে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া থাকে, সে দৃষ্টি তেমনই। সে চাহনি স্থির, অচঞ্চল অথচ বিষাদময়। সে বুঝি তখন তাহার দাম্পত্য জীবনের বিপুল বেদনারাশি আমারই পদে নিবেদন করিয়া নিখিল-স্বামীর চিরশান্তিমাখা চরণে আমার আরোগ্য কামনা করিতেছিল। ঊষার সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃষ্টিই আজিকার এই প্রাণের পরিবর্ত্তন ব্যাপারের মূল; তার পরে যাহা দেখিতেছি, তাহাতেই যেন কত ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে। আমি মরিলে বাস্তবিক তাহার গতি কি হইবে! সহসা আমার কপালের শিরা সমুদয় টন টন করিয়া উঠিল। বুকের মধ্যে ধড় ধড় করিতে লাগিল। সর্ব্বাঙ্গের রোম কণ্টকিত এবং নিঃশেষিত স্বল্লাবশিষ্ট ক্ষীণ রক্তটুকু আগুন হইয়া উঠিল। আমার মনে পড়িল, কাত্তিকঠাকুরদার অভাবে সন্ধ্যা যা করিতেছে, আমার অভাবে ঊষাও তাই করিবে!

কি সর্ব্বনাশ! কি ভীষণ তত্ত্ব! ঊষাও কি সন্ধ্যার মত পরপুরুষের

অঙ্কশায়িনী হইবে? আমার মস্তকের কেশগুলা পর্য্যন্ত ফুলিয়া দাঁড়াইল—আমি কাঁপিতে লাগিলাম।

মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলাম। সন্ধ্যা যেমন, উষা তেমন নয়।

আমার মনের মধ্যে যেন দুইটা মানুষ আসিয়া দাঁড়াইল। দুইজন যেন প্রশ্নোত্তরে বিবাদ বাধাইয়া বসিল।

একজন বলিল, "সন্ধ্যা যেমন উষা তেমন নয় কি গো? উষা আর সন্ধ্যা এক বাপ-মার মেয়ে, একই প্রকার শিক্ষা-দীক্ষা।"

দ্বিতীয় গম্ভীরভাবে বলিল, "উষা সতী, সন্ধ্যা অসতী।"

প্রথম হাসিয়া বলিল, "সন্ধ্যা ত আর মায়ের পেট হইতে অসতী হইয়াই জন্মিয়াছিল না। এই পাপাত্মা পুরুষের প্রলোভনেই মজিয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে।"

দ্বিতীয়। একজন হইয়াছে বলিয়া কি আর একজনেরও হইতে হইবে?

প্রথম। যদি হয়?

দ্বিতীয়। যদির কথা ছাড়িয়া দাও।

প্রথম। আমার বিশ্বাস, নিশ্চয়ই হইবে।

দ্বিতীয়। কেন?

প্রথম। রমণী আর লতা সমান—গাছ যেমন লতাও তেমনি হয়। যার স্বামী পরের সর্ব্বনাশ করে, সেও সর্ব্বনাশী হয়।

আমি যন্ত্রণায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলাম।

দ্বিতীয় বলিল, "অনেক জায়গায় দেখা গিয়াছে, স্বামী কুচরিত্র নরকের কীট, স্ত্রী আত্মসংযমে স্বর্গের দেবী।"

প্রথম। বাহিরে দেখিয়া মানুষের পাপপুণ্য স্থির করা যায় না।

স্বামীর জীবিতকালে যাহাকে সতী বলিয়া জানা যাইত, স্বামীর মৃত্যুর পরে তাহাকে অসতী দেখা গিয়াছে।

দ্বিতীয়। ঊষা সেরূপ মানুষ নয়।

প্রথম। এই পাপাত্মা তাহাকে আজন্ম আদর-সোহাগে বঞ্চিত রাখিয়াছে। প্রেমের সোহাগ, প্রেমের আদর কাহাকে বলে, ঊষা তাহা বুঝিতেই পারে নাই। ইহার মৃত্যুর পরে যদি কেহ তাহাকে সেরূপ আদর লইয়া আহ্বান করে, তখন তাহার হইয়া পড়িবে। সন্ধ্যা বৃদ্ধের নিকট যুবকের রূপ পায় নাই, যৌবনের উদ্দাম সোহাগ পায় নাই, তাহাতেই ত যুবকের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছিল! জীবমাত্রই অপ্রাপ্ত জিনিষের আশা পোষণ করে।

দ্বিতীয়। কিন্তু তেমন মানুষ কোথায় পাইবে?

প্রথম। মানুষের অভাব কি?

সহসা যেন আমি শুনিতে পাইলাম,—স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, কে যেন বলিয়া উঠিল, "কেন, আমি আছি।"

আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘামিয়া গেল। উপাধান হইতে চকিতে মাথা তুলিলাম। উঃ! কি ভয়াবহ দৃশ্য! কি মর্ম্মান্তিক ঘটনা!

আসন্নপ্রায় সন্ধ্যার আবিল ছায়ায় নারিকেল বৃক্ষের মাথার উপরে কার্ত্তিকঠাকুরদা দাঁড়াইয়া, এক দৃষ্টে উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে আমারই দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

জোর করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত সেদিকে চাহিয়া রহিলাম। কি বিকট মূর্ত্তি!

নারিকেল বৃক্ষের উচ্চ শীর্ষ পত্রের উপরে পা দিয়া কার্ত্তিকঠাকুরদা দাঁড়াইয়া আছে! তাহার গায়ে যেন মৃত্যুর কালিমা মাখা, পরিধানে মৃত্যু-মলিন ছিন্ন বস্ত্র, সর্ব্বাঙ্গ খালি। চক্ষু দুইটী কোটরপ্রবিষ্ট—তথাপি

অতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি। কণ্ঠ দিয়া রুধির-ধারা ঝরিতেছে। তাহার বাহুযুগল যেন বাষ্পময়—সেই বাষ্প-বাহুর অভ্যন্তরে যেন প্রতিহিংসার ভীষণ অনল প্রচ্ছন্নভাবে লুকানো আছে। শ্যাম-সবুজ কোমল নারিকেলপত্র তাহার পদভরে ঈষৎ নড়িতেছে। আশ্রয়পত্র ঈষৎ নড়িতেছে—কার্ত্তিক ঠাকুরদাও ঈষৎ নড়িতেছে। কিন্তু সেই ঈষৎ নড়া যে কি ভীষণ, তাহা বর্ণনা করিবার সাধ্য আমার নাই।

সান্ধ্য শান্ত প্রকৃতি ;—উপরে নবোদিত স্নিগ্ধ চন্দ্রকরোজ্জ্বল আকাশ—ধূ ধূ করিতেছে। হু হু করা সন্ধ্যার বায়ু জীবনের বৃহদারণ্যকগাথা গাহিয়া বহিয়া যাইতেছিল। দূরে অতীতের উদ্গীর্ণ কবলের মত পুরাতন মন্দির সর্ব্বাঙ্গে জীর্ণতার রহস্য-কাহিনী মাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে—আর সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে মৃত্যুগন্ধী নিশ্বাস ফেলিয়া কার্ত্তিকঠাকুরদা প্রেতপুরের পূর্ণ স্বরে আবার বলিল, "আমি আছি।"

আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। হৃদয় ফাটিয়া বুঝি রক্তধারা ছুটিতে লাগিল। আমি চক্ষু মুদিত করিলাম, তথাপি নিষ্কৃতি নাই।

আবার চাহিলাম, দেখিলাম—কার্ত্তিকঠাকুরদা সেখানে নাই! কোথায় গেল?

আমার কাণে যেন বজ্রনাদে ধ্বনিত হইতে লাগিল—আমি আছি। আমি আছি।

আবার চক্ষু মুদিত করিলাম।

মুদিত চক্ষুতেই যেন দেখিতে পাইলাম, ঊষা কার্ত্তিকঠাকুরদার প্রণয়াসক্ত হইয়াছে, আমারই সম্মুখে উভয়ে প্রেমের আলাপনে—বড় আনন্দে সময় কাটাইতেছে। মুখে মুখে বাহুতে বাহুতে জড়ান—আঁখিতে আঁখিতে মিশান। প্রতিহিংসার আগুনে আমার প্রাণ জ্বলিয়া উঠিল। আর চক্ষু বুঁজিয়া থাকিতে পারিলাম না, চক্ষু মেলিয়া চাহি-

লাম ;—কেহ কোথাও নাই। কিন্তু প্রাণের জ্বালার উপশম হইল না।

মনে হইল, এ কি সর্ব্বনাশ ; কার্ত্তিকঠাকুরদা মরিয়া গিয়াছে—ভূত হইয়া ফিরিতেছে। সে উষার প্রণয়ী হইবে কি প্রকারে ? বৃথা আমার এ যন্ত্রণা কেন ? স্বপ্ন নহে—স্বপ্ন দেখিলে জাগরণে তাহার জ্বালা যায়। জাগ্রত অবস্থায় আমার এ কি যন্ত্রণা হইতেছে ? কোথাও কিছু নাই—তথাপি এ নরক-যন্ত্রণা কেন ?

চাহিয়া দেখিলাম,ঘরে কখন কে আলো রাখিয়া গিয়াছে। কম্পিত, ঘর্ম্মাক্ত ও অবশ কলেবরে আমি উঠিয়া বসিলাম। বালিশে ঠেসান দিয়া বসিয়া আবার সেই নারিকেল বৃক্ষের দিকে চাহিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, এমন সময় দ্বার ঠেলিয়া উষা গৃহে প্রবেশ করিল।

দ্বাদশ উল্লাস।

শক্তিদান

প্রোজ্জ্বল দীপালোকে উষার দিকে চাহিয়া দেখিলাম। উষাকে সেদিন বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। শুভ্র বসন্তের জ্যোৎস্নায় বালিকা বনশ্রীর বিধবা সঙ্গিনীর মত তবু সে সৌন্দর্য্যে যেন একটু করুণতার রাগ মাখান ছিল। উষার দক্ষিণ হস্তে ঔষধের খল, বাম হস্তে জলের গ্লাস।

উষা আসিয়া আমার শয্যার নিকটে দাঁড়াইল। আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি উঠিয়াছ? একটু আগে যখন আমি আলো জ্বালিয়া যাই, তখন তুমি ঘুমাইয়াছিলে।"

"ঘুমাই নাই, চুপ করিয়া শুইয়াছিলাম," এই কথা বলিয়া উষার মুখের দিকে চাহিলাম। আমার চক্ষুর ভিতর জ্বলিয়া উঠিল। নাসিকা কর্ণ দিয়া আগুনের হল্কা ছুটিল, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘাম বাহির হইল, উষার রক্ত-রাগ-রঞ্জিত গণ্ডে চুম্বন-চিহ্ন!

অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিলাম না। উষা বুঝি আমার সে অবস্থা বুঝিতে পারিল, সে বিষাদ-কম্পিতস্বরে করুণভাষায় জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি অমন করিতেছ কেন? তোমার কি অসুখ বাড়িয়াছে?"

আমার স্নায়ুমণ্ডলী শিথিল হইয়া আসিতেছিল। চক্ষুর সম্মুখে আলোকমণ্ডিত গৃহদ্বার প্রভৃতি যেন বর্ত্তুলাকারে ঘুরিতেছিল। অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিলাম না। উষা ধীরে ধীরে পালঙ্কে উঠিয়া আমার পার্শ্বে বসিয়া তাহার কবোষ্ণ-মমতায় প্রস্ফুটিত পেলব প্রসূন-করে আমার

বক্ষোদেশ মার্জ্জন করিতে লাগিল। হয় ত সে ভাবিয়াছিল, ব্যাধির তাড়নায় কি প্রকারে আমার দম বদ্ধ হইয়া আসিয়াছে।

আমি নিষেধ করিলাম, বিরক্তিসহকারে তাহার হাত সরাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঊষা, একটা সত্য কথা বলিবে?"

স্মিতমুখ ঈষৎ উন্নত করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া ঊষা বলিল, "আমি ত কখনও মিথ্যা বলি না;—বিশেষ তুমি আমার দেবতা; তোমার সহিত মিথ্যা বলিব কেন?"

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগে হৃদয়জ্বালা উপশমের ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়া দৃঢ়তার সহিত আমি বলিলাম, "ও সব কথা ছাড় ঊষা"—

ঊষা বিস্ময়াবিষ্ট হইল। আমার কথায় সে কিছু ভীত, কিছু বিস্মিত ও কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাহার চোখ মুখ দেখিয়া এবং তাহার গলার কম্পিত স্বর শুনিয়া,আমি তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছিলাম। ঊষা বলিল, "কি সব কথা ছাড়িব?"

আমি। ছলনার কথা।

ঊষা। ছলনার কথা! আমি তোমার সহিত ছলনা করি,—ছিঃ, তুমি কেন এ ধারণা করিতেছ? তুমি স্বামী, আমি স্ত্রী, আমি তোমার সঙ্গে ছলনা করিব!

আমি। যদি কখনও করিয়া থাক, আজ করিয়ো না। আমার আর সময় নাই—মরণ দেশে যাত্রা করিয়াছি। যাহা সত্য—তাহা লুকাইয়ো না। পৃথিবীর গুপ্তরহস্য—প্রসুপ্ত-বিনিময়-বৈদিকতত্ত্ব জানিয়া যাইতে সাধ হইয়াছে।

ঊষা বোধ হয় আমার কথা বুঝিতে পারিল না, সে করুণ-দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমার বুকের মধ্যে তখন যে কি জ্বালা, তাহা বুঝাইয়া বলি, এমন ভাষা আমি জানি না। ঊষাকে

যদিও কখনও ভালবাসি নাই—যদিও কখনও তাহাকে দাম্পত্য প্রেমের বিন্দু দানেও সোহাগ করি নাই, তথাপি সে পবিত্র—সে আমার, এ ধারণা—এ বিশ্বাস ছিল। আমি যতই তাহার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করি, যেরূপেই তাহার প্রতি পশু-ব্যবহার করি, সে আমার মুখ চাহিয়া—আমার হইয়া থাকিবে, অথবা থাকিতে বাধ্য, এইরূপ ধারণা দৃঢ়মূল হইয়াছিল। আজ হঠাৎ তাহা লুপ্ত হইল। কে—কোন্ বিদেহী মানব—অথবা কোন দেহী তাহাকে প্রাণের বিনিময়ে বাঁধিয়া লইয়াছে। উষার হৃদয়ে আমার জন্য যে শান্ত-স্নিগ্ধ-নিবিড় নিরাপদ পুণ্য প্রেম-নীড় প্রতিষ্ঠিত ছিল, হয় ত আমারই কর্ম্মের ফলে এতদিনে তাহাতে একটা ক্রুর সর্প মৃত্যুময়—গরলময় বিবর খুঁড়িতে বসিয়াছে। সে হৃদয়ে একটা শ্যাম-স্নিগ্ধ বিশল্যকরণী ছিল, মর্ম্মযোড়া শত শক্তিশেলবিদীর্ণ আমার কলুষিত প্রাণও হয় ত একদিন আরোগ্য হইত, কিন্তু তাহা তাহার উষ্ণ বিষদগ্ধ নিশ্বাসে চিরদিনের মত শুকাইয়া গেল। জীবনের গভীরতম স্তর হইতে উষার ক্ষুদ্র হৃদয়ের অন্তস্তলে যে একটা করুণভাবে ভালবাসার ঊর্ম্মি উঠিত, যে মহাসাগর আমাকে চাঁদ মনে করিয়া প্রতিদিন নিশীথ-স্বপ্নে জড়াইতে গিয়াছে, তাহা আমার কর্ম্মফলে কোন্ পাপাত্মার ওষ্ঠ-ছাপে—প্রেম-আলিঙ্গনে মরুভূমি করিয়া ফেলিয়াছে! দেবতার কি দয়া নাই?

রুক্ষ—ধূ ধূ—মরুময়—রৌদ্রদগ্ধ কর্ম্মভূমি! তোমার এ কেমন বিচার! আমি পাতকী—অনন্ত মহাপাতকে পাতকী—আমার বুকে দধীচির অস্থি-প্রস্তুত বজ্র পাত হউক, সহস্র রৌরব—সহস্র পূতিগন্ধ নরক আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট হউক; কিন্তু আমার কর্ম্মফলে উষার পতন হইবে কেন?

আমার কপাল দিয়া গল গল করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। বিষণ্ণ

চক্ষু মুদিত হইয়া আসিতে লাগিল। আমি বালিসের উপরে ঢলিয়া পড়িতেছিলাম, উষা ধাঁ করিয়া সরিয়া আসিয়া তাহার ক্রোড়ে আমার মস্তক ধরিল, এবং তালপত্রের ব্যজনী দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিল।

উষার স্পর্শ অত্যন্ত কষ্টকর হইল। যতক্ষণ উঠিবার শক্তি ছিল না, ততক্ষণ তাহার ক্রোড়ে মাথা ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম, যে মাত্র একটু শক্তি হইল, অমনি উঠিয়া বসিলাম। শূন্যক্রোড় উষা যেন কিছু নিরানন্দ—কিছু উদাসভাবযুক্ত হইয়া ব্যাধ-জালধৃতা হরিণী যেমন ব্যাধকর-নিহতোদ্যম হরিণের দিকে চাহে, তেমনই ভাবে আমার দিকে চাহিল।

আমি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া দমে দমে বলিলাম, "উষা, তুমি আর আমার নিকটে আসিয়ো না।"

উষার মুখ বিষণ্ণ হইল। দর্পণে হাই দিলে তাহা যেমন ঘামিয়া উঠে, উষা তেমনই ঘামিয়া উঠিল। কচি কলাপাতে আগুনের সেক দিলে তাহা যেমন বিবর্ণ হইয়া উঠে, উষা তেমনই বিবর্ণ হইয়া উঠিল। করুণ-নয়নের উদাস দৃষ্টি আমার মুখের উপর সংস্থাপন করিয়া করুণ স্বরে বলিল, "কেন, আমি তোমার কাছে আসিব না কেন? চিরজীবন কাছে আসিতে দাও নাই—তখন সুস্থ ছিলে, না আসিতে দিলেও তত অধিক ব্যথা পাই নাই। কিন্তু এখন? এখন তুমি পীড়িত, এখন রোগ-দীর্ণ—এখন তোমার নিকটে না আসিয়া থাকিতে পারিব না; কেহই পারে না। স্বামীর রোগ-দীর্ণ দেহের শুশ্রূষা না করিয়া দূরে থাকিতে পারে, এমন মেয়েমানুষ আজিও জন্মে নাই। কিন্তু একটা কথা—

আমি। কি কথা?

উষা। যে অধিকারে আমায় একদিন স্বর্গসুখ হইতে অধিক সুখ দান করিয়াছ, আজ কেন তাহা হইতে হঠাৎ বঞ্চিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? দিদি কি তোমায় নিষেধ করিয়াছে?

আমি। না ?

উষা। তবে তোমার এরূপ ভাবান্তর হইল কেন ? আমাকে সত্য বলিতে প্রতিজ্ঞা করাইতেছিলে কেন ?

আমি। হাঁ—কথাটা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। না ভুলিয়া আর কত পারি। একটা ক্ষুদ্র প্রাণ—আর জগতের কতটি প্রাণ তাহাকে দগ্ধ করিতে—নষ্ট করিতে—রৌরবে নিক্ষেপ করিতে সমুদ্যত ! সর্ব্বদা ভীত চঞ্চলিত সন্তাড়িত প্রাণ লইয়া যে আছি, সে কেবল পরমায়ু ক্ষয় না হওয়ায়—মৃত্যু অভাবে। কিন্তু মৃত্যুর পরে আমার পরিণাম—দূর ছাই ; যে কথা হইতেছিল ! তুমি যদি মিথ্যা বলিবে না বলিয়া সত্য কর, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

উষা। সত্য করিলাম, মিথ্যা বলিব না।

আমি। তোমার গালে কিসের দাগ ?

দ্রুতগমনশীল পথিকের পদতলে বিষধর সর্প পতিত হইলে, সে যেমন চমকিয়া উঠে, উষা তেমনই চমকিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বাম-গণ্ডে হস্তার্পণ করিয়া চকিত অথচ মৃদুকম্পিতস্বরে বলিল, "আমার গালে দাগ !"

উষার দক্ষিণগণ্ডে স্পষ্ট চুম্বনচিহ্ন। বিরক্তি ও ঘৃণার সহিত আমি বলিলাম, "বাঁ গালে নয়। ডা'ন গালে।"

উষা দক্ষিণগণ্ডে হস্তার্পণ করিল। বলিল, "দূর। আমার গালে আবার কিসের দাগ হবে !"

গৃহদেওয়ালে দর্পণ লম্বিত ছিল, আমি বলিলাম, "উঠিয়া আয়নার কাছে গিয়া দেখ।"

উষা সে কথা গ্রাহ্য করিতেছিল না। আমি যখন পুনঃপুনঃ দেখিতে বলিলাম, তখন সে উঠিয়া গেল। দর্পণে নিজ গণ্ডদেশ দর্শন করিয়া

সেও চমকিয়া উঠিল। আমি তাহার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়াছিলাম, দেখিলাম, বায়ুতাড়িতা বেতসীর মত থরথর কাঁপিতেছে। সে যে স্পষ্ট —অতি স্পষ্ট চুম্বনচিহ্ন।

আমি ডাকিলাম, "ঊষা!"

ঊষা উত্তর দিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। আমি বলিলাম, "এদিকে এস, আরও কয়টা কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে।"

যন্ত্রচালিত পুতুলের মত ঊষা আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মূর্ত্তি তখন বড় বিষন্ন—হিমানীপাতসংক্লিষ্ট নলিনীর সহিত উপমেয়।

আমি বলিলাম, "আমার সহিত মিথ্যা বলিয়ো না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মরণ-পথের পথিক আমি, সংসারের আশা-ভালবাসা সুখ-স্বচ্ছন্দ আর আকাঙ্ক্ষা করি না—কেবল জানিতে ইচ্ছা, কি দিয়া কি ঘটাইয়া বসিয়াছি! ভাল, তোমার গালে কে চুম্বন করিল?"

ঊষা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "তুমি আমার দেবতা, জীবনে কখনও মিথ্যা বলি নাই, এখনও বলিব না। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কেহই আমাকে স্পর্শ করে নাই।"

আমি। তবে গালে দাগ হইল কেমন করিয়া?

ঊষা। তা' বলিতে পারি না।

আমি। দাগ হইয়াছে, তাহা দেখিয়াছ?

ঊষা। হাঁ, দেখিয়াছি।

আমি। গালে দাগ কি আপনি হয়?

ঊষা। না।

আমি। তবে?

ঊষা। তুমি স্বামী—তুমি দেবতা, আমি তোমার চরণস্পর্শ করিয়া

বলিতে পারি, আমি কিছুই জানি না। আমার গালে কেহ কোনরূপে স্পর্শ করে নাই, জোরে একটু বাতাসও লাগে নাই। তবে কি প্রকারে যে অমন বিশ্রী দাগ হইল, তাহা বলিতে পারি না।

আমি কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিলাম। চিন্তা করিয়া বিশেষ কোনরূপ ফল হইল না, কোন একটা তত্ত্বে উপনীত হইতে পারিলাম না। একবার মনে হইল, হয় ত উষা মিথ্যা কথা বলিতেছে। কোন গুপ্ত নায়কের সহিত প্রেম-আলাপন করিয়া কোন্ রমণী তাহা স্বামীর নিকট বলিয়া থাকে! শত দিব্য দিয়া সহস্র প্রতিজ্ঞা করাইলেও কখনও সে কথা বলে না। উষাও গুপ্তপ্রণয়ীর ওষ্ঠসম্পুটচিহ্ন আমার নিকটে লুকাইয়া যাইতেছে।

কিন্তু উষার ভাবভঙ্গী দেখিয়া, চোখ মুখের অবস্থা দেখিয়া, মনে হইতেছিল, এই চিহ্ন দর্শনে তাহার মনে আতঙ্ক হইয়াছে—বিস্ময় হইয়াছে, সে হয় ত এ সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

তবে কি প্রকারে এ চিহ্ন হইল? কার্ত্তিকঠাকুরদা নারিকেলপত্রের উপরে দাঁড়াইয়া বলিয়া গেল—'আমি আছি। উষার প্রণয়ী আমিই হইব।' তবে কি সেই প্রেতদেহ উষার নিকটস্থ হইয়া চুম্বন করিয়া গেল। প্রেতের চুম্বন উষা জানিতে পারে নাই, অলক্ষ্যে—অদর্শনীয় ভাবে চুম্বন করিয়া গিয়াছে? প্রতিশোধ লইবার জন্য সত্যই কি সে আমার স্ত্রীকে দখল করিয়া বসিল? প্রেতগণ কি ইচ্ছা করিয়া এ সকল কাজ করিতে পারে? হায়, তবে কি আমার কর্ম্মফলে—আমার কুকর্ম্মের বিনিময়ে উষাকেও পাপে মজিতে হইল?

আমি বড় কাতর হইয়া পড়িলাম। প্রাণের মধ্যে বাজের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে কাটাইয়া দিলাম।

উষা ততক্ষণ পর্য্যন্ত অনিমিক্‌নয়নে করুণ-উদাস চাহনিতে আমার

মুখের দিকে চাহিয়াছিল। যখন আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বালিসের উপরে একটু উঠিয়া বসিলাম, তখন বড় কাতরস্বরে—বড় আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে ঊষা বলিল, "তুমি কি আমায় অবিশ্বাস করিলে ?"

পুনরপি দীর্ঘশ্বাসে হৃদয়-তাপ বিদূরিত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া আমি বলিলাম,"যে মহাপাতক করিয়াছি, তাহার প্রতিফল পাইব না ? আমার পত্নী অবিশ্বাসিনী হইবে না ? যে আগুনে কার্ত্তিকঠাকুরদার হৃদয় জ্বালাইয়াছি, সে আগুনে আমার হৃদয় জ্বলিবে না ?"

ঊষা দশবার কথা কহিতে গিয়া থামিয়া পড়িয়া অবশেষে বলিল, "তুমি নিশ্চয় জানিয়ো—তোমার দাসী, তোমার ঊষা কখনও অবিশ্বাসিনী নয়। অপর শত পাতকে পাতকিনী ঊষা—স্বামীর নিকটে অতি বিশ্বাসী ! স্বামীই তাহার জীবনের ধ্রুবতারা।"

ঊষার কথায় আমার আরও কষ্ট হইল। মনে হইল, হয় সে মিথ্যার ছলনাজালে আমাকে ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে, নয় প্রতি-হিংসা-সাধনেচ্ছু কার্ত্তিকঠাকুরদার প্রেত-আত্মা এই সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে। হঠাৎ দরোজা নড়িয়া উঠিল। আমার ভগিনী পুঁটি গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল। ঊষা ধাঁ করিয়া নামিয়া পালঙ্কপার্শ্বে দাঁড়াইল।

পুঁটি বলিল, "দাদা, তন্ত্ররত্ন ঠাকুর এসেছেন।"

আমি। কে তন্ত্ররত্ন ঠাকুর ?

পুঁটি। যিনি প্রেততত্ত্বে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। যাঁহাকে আনিবার জন্যে নীলুখুড়ো কাশী গিয়েছিলেন। এইমাত্র নীলুখুড়ো তাঁহাকে লইয়া আসিয়া পঁহুছিলেন। বাবা বৈঠকখানায় তাঁহাদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

ঊষা সে সংবাদে বড়ই হর্ষোৎফুল্ল হইল। কার্ত্তিকঠাকুরদার আতি-বাহিকদেহের অত্যাচারের কথা বাড়ীশুদ্ধ সকলেই শুনিয়াছিল এবং বৃহ

চিকিৎসাতেও যখন রোগ আরোগ্য হইল না, তখন যে উহা ভৌতিক ব্যাধি, তাহাই সকলের ধারণা হইয়াছিল। দেশের ছোট-খাট অনেক ওঝা দেখান হইয়াছিল, এখন কাশীর তন্ত্ররত্ন মহাশয় আসিলেন।

আমি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, রুগ্ন দেহটাকে একটু ঘুরাইয়া লইয়া ভগ্ন-মৃদু-করুণ স্বরে বলিলাম, "আর বোন্, প্রেততত্ত্বের পণ্ডিত, এ হৃদয়ের নরক নিবারণ করিতে বুঝি ভগবানের সুদর্শন চক্রও অক্ষম।"

পুঁটি। কেন, দাদা; তুমি অত ভাব কেন? কোন ভয় নাই। তোমাকে ভূতে দৃষ্টি দিয়ে রেখেছে, উপযুক্ত ওঝার মন্ত্রবলে কোথায় পালিয়ে যাইবে। তখন দেহ-রোগ মুক্ত হবে——

আমি। আর মন?

পুঁটি। মনও স্বচ্ছন্দ হবে। ভূত-প্রেত-পিশাচ—ওরা নরকের সহচর কিনা, ওদের দৃষ্টিতে মন অপবিত্র হ'য়ে যায়, কাজেই শান্তি থাকে না—সুখ থাকে না, আনন্দ থাকে না।

হায়, পুঁটি! তুইও জানিস্, পাপে শান্তি থাকে না, সুখ থাকে না। জগতে কেবল আমিই আগে জানি নাই, বুঝি নাই—শিখি নাই। জানিলে কি এমনি করিয়া মরি! এমনি করিয়া দগ্ধ হই!

উষার দিকে একবার চকিতে চাহিয়া লইলাম। দেখিলাম, তাহার বিষণ্ণ মুখে যেন আশার একটু ক্ষীণ আনন্দ-রেখা ফুটিতেছে। বর্ষা-বিদ্যুৎমেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যা রজনীর পূর্ব্বকাশে উষার মৃদু আলোকরশ্মি যেন দেখা যাইতেছিল।

আমি ডাকিলাম, "উষা।"

পুঁটির সাক্ষাতে উষা আমার সহিত কথা কহিত—কারণ পুঁটি ছোট, উষার সমবয়সী হইবে।

উষা উত্তর করিল, "কেন।"

তাহার গলার স্বর জড়ান। আমি বলিলাম, "তন্ত্ররত্ন ঠাকুর নাকি আমার দেহ হইতে ভূত নামাইয়া দিবেন ?"

উষার চক্ষু দিয়া জল ঝরিল। বলিল, "দিবেন বৈ কি। আমি কি ভগবানের চরণে এতই পাপ করিয়াছি যে, আমার সুখের দিন আসিবে না।"

আমি। কিন্তু ঐ দাগ!

উষা নতবদনে বলিল, "উহাও ভৌতিক। এই সঙ্গে উহাও সারিয়া যাইবে ?

আমি। মনের দাগ যাইবে কি ?

পুঁটি দাগের কথা কিছুই জানে না, বুঝিলও না—বুঝিতে চেষ্টাও করিল না। সে এক মীমাংসা এই করিয়া লইল যে, ভূতের শ্রেষ্ঠ ওঝা তন্ত্ররত্ন ঠাকুর যখন আসিয়াছেন, তখন গায়ের দাগই হউক, আর মনের দাগই হউক, সবই সারিয়া যাইবে। দাদার শরীরের যেখানেই দাগ আছে, সবই ভূতের দাগ। হায়, পুঁটি.; তুই জানিস্ না—দাগ পড়িলে সহজে উঠে না। দাগা না দিয়া দাগ যায় না।

উষা বলিল, "আমি তোমার দাসী ; আমাকে দোষী ভাবিয়ো না। যে দাগই হউক, শীঘ্র ধরা পড়িবে।"

এবার পুঁটি কিছু রাগিল। বলিল, "বউ কি তেমনি যে, তোমার গায়ে দাগ ক'রে দেবে ? ও ঠিক লক্ষ্মীঠাকরুণ! তবে সেই আবেগে মাগী বোধ হয়, কোন্ দিন কি রকম দাগ করে দিয়েছিল।"

পুঁটিকে উষার গণ্ডচিহ্ন সম্বন্ধে জানিতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলাম না। কাজেই সে সম্বন্ধে আর কিছু তখন উত্থাপনও করিলাম না।

ইহার কিঞ্চিৎ পরেই বাবা ডাকিলেন, পুঁটি দৌড়িয়া বাহিরে গেল এবং ফিরিয়া আসিয়া ঊষাকে সঙ্গে লইয়া গৃহান্তরে প্রবেশ করিল।

তাহার কয়েক মুহূর্ত্ত পরে বাবা, নীলুখুড়ো, তন্ত্ররত্ন ও আরও দুই-জন নিকট আত্মীয় ভদ্রলোক আমার ঘরে আসিলেন।

গৃহপ্রবেশ করিয়া উৎসাহব্যঞ্জক স্বরে নীলুখুড়ো আমায় ডাকিয়া বলিলেন, "ওঠ বাবা, তন্ত্ররত্ন মশায় এসেছেন, ইনি তোমার সকল আপদ দূর করিবেন।"

বাবা একখানা চেয়ার টানিয়া তন্ত্ররত্নমহাশয়কে বসিতে দিলেন। আমার পালঙ্কের সংলগ্নভাবে চেয়ার টানিয়া দিলেন, কাজেই তন্ত্ররত্ন মহাশয় আমার খুব নিকটেই উপবেশন করিলেন। আমি অতি কষ্টে উঠিয়া বালিসে ঠেসান দিয়া বসিলাম।

তন্ত্ররত্নমহাশয় একদৃষ্টে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তেমনতর তীব্রভাবে একদৃষ্টে চাহিয়া তিনি কি দেখিতে লাগিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু সকলেই নীরব—কাহারও মুখে কোন কথা ছিল না।

এইরূপে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল।

ত্রয়োদশ উল্লাস।

অগ্নি পরীক্ষা।

কতক্ষণ পরে তন্ত্ররত্নঠাকুর মৃদু হাসিলেন। তারপরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি কখনও ভূত দেখিয়াছ?"

তন্ত্ররত্নের হাসি ও প্রশ্নের উদ্দেশ্য আমি বা আমার পিতা কিম্বা নীলুখুড়ো কাহারই বোধগম্য হইল না। বাবা ও নীলুখুড়ো আমার মুখের দিকে ঔৎসুক্যের দৃষ্টিতে চাহিলেন। আমি একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম, "ভূত কি আছে?"

তন্ত্র। আছে।

আমি। যদি থাকে, তবে সকলে দেখিতে পায় না কেন? আপনার মত অনেকের মুখে শুনিয়াছি, ভূত আছে;—এদেশের অশিক্ষিতা রমণীগণ পর্য্যন্ত ভূতের গল্প জানে—ভূতে নৈবেদ্য খায়, জনশূন্য গৃহ তাহার আবাস স্থান, গভীর নিশীথে শাঁকিনীর সহিত আলেয়া জ্বালাইয়া ঝগড়া করিতে বসে। কিন্তু শিক্ষিত লোকে তাহা দেখিতে পায় না কেন? গল্পে শোনা যায়, চোখে দেখা যায় না কেন?

তন্ত্র। তুমি কি এ পর্য্যন্ত ভূত দেখিতে পাও নাই?

আমি। আমার কথা ছাড়িয়া দিন। আমি রুগ্ন—আমার জীবন বহুবিধ ঘটনা সম্বলিত,—আমি বিভীষিকা দেখি কি ভূত দেখি, তাহার স্থিরতা নাই। সেই সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত করিবার জন্যই আপনাকে জিজ্ঞাসা করা। আপনি যখন আমাকে চিকিৎসা করিতে আসিয়াছেন, তখন আমার সব কথাই আপনাকে বলিব বৈ কি;—কিন্তু আগে ভূত আছে কি না, তাহা জানা প্রয়োজন।

তন্ত্র। হাঁ আছে, মানুষের মত তোমার আম্মার ভিতর বস-বাস করে, এমন ভূত আছে।

আমি। আপনি কি বলিতেছেন? যে ভূত নরকে থাকে, বৈতরণীর কূলে আহার-পানীয়ের অভাবে কাঁদিয়া বেড়ায়, সে ভূতের কথা নয় কি? কিন্তু নরক, ভূত, ওসকল কথা এখনকার শিক্ষিত লোকে আদৌ বিশ্বাস করেন না।

তন্ত্র। নরকও আছে, ভূতও আছে।

আমি। আপনি দেখিয়াছেন, না শুনিয়াছেন?

তন্ত্র। আমি দেখিয়াছি এবং প্রতি মুহূর্ত্তে দেখিতে পাই। ব্যাকরণের মতে নর শব্দের উত্তর অল্পার্থক ক প্রত্যয় প্রয়োগে 'নরক' হয়। সংসারে যে অল্প লোক, যে ক্ষুদ্রত্বের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, সেই নরক,—তাহারই ধমণীর ভিতরে তপ্ত বৈতরণী বহিয়া যায়। যত আহার—যত পানীয়ই তাহার গৃহে সঞ্চিত থাকুক না কেন, আত্মা তাহার চিরদিনই পিপাসায়—উপবাসে কাঁদিয়া বেড়ায়।

আমি। কথাগুলো আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলুন, আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

তন্ত্র। ভূত আছে কি না, এই তোমার প্রশ্ন;—কেমন?

আমি। আজ্ঞা, হাঁ।

তন্ত্র। তদুত্তরে আমি বলিতেছি, ভূত আছে। কিন্তু জানা প্রয়োজন, ভূত কি। যাহারা মুক্ত না হয়, তাহারাই ভূত বা প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়। তবে এখন মুক্তির কথা জানা আবশ্যক।

আমি। হাঁ, জানা আবশ্যক। কিন্তু তা বোধ হয় সবাই জানে।

তন্ত্র। তুমি জান?

আমি। জানি।

তন্ত্র। কি বল দেখি ?

আমি। ঈশ্বরে মিলিয়ে যাওয়াই মুক্তি।

তন্ত্র। হিন্দু মত কতকটা ঐরূপ হইলেও অপর ধর্ম্মিগণের মত ঠিক ঐরূপ নহে।

আমি। তা নয়, সে কথা আমিও জানি।

তন্ত্র। তাঁহাদের মত বা চিন্তা মুক্তি পর্য্যন্ত আজিও পঁহুছে নাই। স্বর্গ ও নরক পর্য্যন্তই শেষ হইয়াছে। পাপ করিলে নরক আর পুণ্য করিলে স্বর্গ—এই পর্য্যন্তই তাঁহাদের আত্মিকজীবনের শেষাবস্থা। তাহার পরে যে আর কোন অবস্থা আছে, তাহা তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রমতে এখনও নির্ণীত হয় নাই। সেই অবস্থাই মুক্তি। মুক্তি অর্থে নিষ্কৃতি। স্বর্গ-নরকের দুই পার্শ্বে দুইটী অবস্থা আছে—তাহার একটি প্রেতাবস্থা, অপরটি মুক্তি। জৈবিজীবনের অবসান হইলে অর্থাৎ স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া মানুষ মৃত্যুর অধীন হইলে জীবাত্মা, কোন পদার্থের আসক্তিতে যখন নরকে যাইবার পথ পায় না, স্বর্গে যাইবারও অধিকারী না, তখন সে ভূতাবস্থাপ্রাপ্ত হয়। আর মৃত্যুর পরে মানুষের প্রাণ যদি স্বর্গ নরকেও আবদ্ধ না থাকে—অর্থাৎ পাপ-পুণ্য বা শুভাশুভ কোন কর্ম্মই তাহাকে বাঁধিতে না পারে, তবে সে সর্ব্বভূতে প্রতিষ্ঠিত—কাজেই সে ভূতাতীত বা মুক্ত। আর পাপ-পুণ্য—শুভাশুভ কর্ম্মের ফলে মানুষ স্বর্গ বা নরকবাসে অধিকারী এবং তাহারই ফলে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইয়া থাকে।

আমি। অত দর্শন-বিজ্ঞানের কথা আমি শুনিতে চাহি না—ভাল লাগে না। রোগে রোগে মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, অত কথা ধারণা করিতে পারি না।

তন্ত্র। আমিও অত কথার আলোচনা করা সঙ্গত মনে করি না।

তুমি ভূত দেখিয়াছ কি না বলিলে, আমি তোমার রোগের কারণ নির্ণয় করিতে পারিতাম, এবং কি প্রকারে তুমি আরোগ্য হইতে পারিবে, তাহারও উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারিতাম।

আমি। বলিবার আমার অনেক আছে, কিন্তু বলিব না।

তন্ত্র। কেন?

আমি। সমাজ ও আইন অনেকস্থলে সত্য বলিবার বাধা জন্মাইয়া দেয়।

তন্ত্র। তোমার কৃতকার্য্যের কথা আমি নীলুবাবুর মুখে অনেক শুনিয়াছি, এক্ষণে তোমার নিকটে কয়েকটি কথা শুনিতে পাইলেই চিকিৎসা করিতে পারি।

আমি। জিজ্ঞাসা করুন, যদি বলিবার হয়, বলিব।

তন্ত্র। কার্ত্তিকবাবুর প্রেতমূর্ত্তি তুমি কোথায় এবং কি ভাবে দেখিয়া থাক? .

আমি ধীরে ধীরে নিশ্বাসে নিশ্বাসে সমস্ত কথা তাঁহার নিকটে ব্যক্ত করিলাম। তিনি অনেক চিন্তা করিলেন। নীরবে নিস্তব্ধে— সকলেই নীরবে নিস্তব্ধে। কেবল গৃহ-দেওয়ালস্থ ঘড়ীটা সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া টীক্ টীক্ শব্দ করিতেছিল।

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া তন্ত্ররত্নঠাকুর বলিলেন, "রোগ সারা কঠিন।"

আমার পিতা ব্যাকুলনয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আকুল-স্বরে বলিলেন, "কেন ঠাকুর, রোগ সারা কঠিন কেন?"

তন্ত্ররত্ন তখন আমার হস্ত-প্রকোষ্ঠ টিপিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিতে-ছিলেন। বাবার কথার উত্তরে বলিলেন, "বলিতেছি।"

নীলুখুড়ো বলিলেন, "সে কি ঠাকুর, আপনি যে বলিলেন, যেরূপ ভূতগ্রস্থই হউক, আমি সারিয়া দিব।"

আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া অধিকতর বিষন্নমুখে তন্ত্ররত্নঠাকুর বলি-লেন, "ভূতে দুই রকমে পায়। এক রকম, গত জীব অর্থাৎ স্থূলদেহমুক্ত আত্মা স্থূলদেহবদ্ধ আত্মায় আবিষ্ট হয়, তাহাকে ভূতে পাওয়া বলে। সেগুলা সারা খুব সহজ।"

নীলু। আর এক প্রকার কি?

তন্ত্র। সেইটাই কঠিন। মানুষ কাহারও অনিষ্ট করিলে তাহার চিন্তা মানুষের মনের সর্ব্বাঙ্গে মাথা হইয়া যায়। স্বপনে-শয়নে সেই চিন্তাই তাহার অবলম্বনীয় হয়। সেই চিন্তাই তখন তাহাকে পাইয়া বসে;—সে সেই পাপের দহনে গলিয়া তদাকারপ্রাপ্ত হয়। সেও ভূতে পাওয়া। সে চিন্তা তাহাকে পাইয়া বসে—কিছুতেই ছাড়ে না। সেই চিন্তাই নিম্নমুখী হইয়া নানাবিধ পাপদৃশ্যের সৃষ্টি করে। মানুষ তখন তাহার অধীন হইয়া জীর্ণশীর্ণ হয়, এবং মরণের পরে সেই নরক বুকে করিয়া হাহাকার করিয়া ফিরিতে থাকে।

নীলু। তবে ইহাকে ভূতে পাওয়া বলিব কেন?

তন্ত্র। হাঁ, ইহাও ভূতে পাওয়া। মনস্তত্ত্ববাদের ইহা একটি স্তর—অবসাদগ্রস্ত মন ক্রমে ক্রমে ভূত সাজিয়া বসে। প্রেতাবিষ্ট মানুষের উদ্ধার আছে—নিষ্কৃতি আছে, চিন্তাবিষ্ট মানুষের উদ্ধার বা নিষ্কৃতি নাই।

আমার মনের মধ্যে বড় জ্বালা উপস্থিত হইল। দুইবার পার্শ্ব পরি-বর্ত্তন করিলাম, সে জ্বালার অন্ত হইল না। দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তন্ত্ররত্নঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি যাহা বলিলেন, তাহা বিশ্বাস হয় বটে, কিন্তু তেমন প্রমাণের মধ্যে আসে না।"

মৃদু হাসিয়া তন্ত্ররত্ন বলিলেন, "মানুষে মানুষ খুন করে। খুন করিয়াই তাহার খুনের চিন্তা প্রবল হয়। চিন্তা তাহার সমস্ত প্রাণে

যুড়িয়া বসে। চিত্ত খুনের আকার গ্রহণ করে। সে তখন খুন প্রকাশ না করিয়া থাকাকে কষ্টকর অবস্থা বলিয়া মনে করে। এই কষ্টকর অবস্থা চিন্তনীয় হইয়া পড়ে—সেই চিন্তাই তখন তাহাকে ভূত বানাইয়া নরকের পাংশু-স্তূপে টানিয়া লয়।

আমি তন্ত্ররত্নঠাকুরের নিকট কোন গুপ্ত কথা বলিব বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করায়, অপর সকলে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। আমি তখন তন্ত্ররত্নঠাকুরের নিকটে আমার অবস্থা বিশদভাবে বর্ণনা করিলাম, এবং সেইদিন উষার গণ্ডে যে চুম্বনের দাগ দেখিয়াছিলাম, তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম।

তন্ত্ররত্ন ঔৎসুক্যনয়নে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার স্ত্রীকে আমার সম্মুখে ডাকিতে কোন আপত্তি আছে কি?"

আমি। কেন, সে এখানে কি জন্য আসিবে?

তন্ত্র। আমি একবার সেই দাগটা দেখিতাম।

আমি। আপনি দাগ দেখিয়া কি বুঝিবেন?

তন্ত্র। সেটা বাস্তবিক চুম্বনের দাগ কি চিন্তাশক্তির দাগ।

আমি। চিন্তাশক্তির দাগ কি মহাশয়?

তন্ত্র। তোমার স্ত্রীকে ডাক—দাগ দেখিয়া তারপরে বুঝাইয়া বলিব।

আমি ঝিকে ডাকিলাম। সে আসিলে আমার স্ত্রীকে ডাকিয়া দিতে বলিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে আমার ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া আমার স্ত্রী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তন্ত্ররত্ন ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ দাগ কোথায়?"

উষা লজ্জায় নতবদন হইল। তাহার মুখে ঘোমটা ছিল। আমি

ঘোমটা তুলিতে বলিলাম। সে তাহা পারিল না—ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমি বড় ব্যথিত হইলাম। কিন্তু কি করিব—মুখের কাপড় তুলিতে আদেশ করিলাম।

আমার ভগিনী এই ব্যাপারের কোন কারণ বুঝিতে পারে নাই। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বৌর মুখের ঘোমটা তুলিতে হইবে কেন?"

আমি। ওর মুখে একটা বিশ্রী দাগ পড়িয়াছে—সে দাগ কেন পড়িল, তাই দেখিয়া তন্ত্ররত্নঠাকুর শুভাশুভ বিচার করিবেন।

আমার ভগিনী উষার মুখের ঘোমটা তুলিয়া ধরিল। কি আশ্চর্য্য! কোথাও কোন দাগ নাই—নির্ম্মল দর্পণের মত সে মুখ শোভা পাইতেছিল। সান্ধ্যনলিনীর মত মুখখানা ম্লান, বিষণ্ণ—কিন্তু কোন দাগে কলঙ্কিত নহে। আমি বিস্মিত হইলাম, তন্ত্ররত্নঠাকুর বলিলেন, "কৈ, দাগ কোথায়?"

আমি। এখন আর দেখিতেছি না।

তন্ত্র। কতক্ষণ আগে দেখিয়াছিলে?

আমি। বড় অধিকক্ষণ নহে—আধ ঘণ্টা হইতে পারে।

তন্ত্র। যে দাগটি দেখিয়াছিলে, তাহা কি আধ ঘণ্টার মধ্যে লুকাইবার সম্ভাবনা বলিয়া জ্ঞান কর?

আমি। না।

তন্ত্র। কি, না?

আমি। আধ ঘণ্টায় সে দাগ যাইবার নহে।

তন্ত্র। তবে গেল কেন?

আমি। তা বলিতে পারি না।

তন্ত্র। সে দাগ আর কেহ দেখিয়াছিল?

আমি। জানি না।

তন্ত্র। তোমার দুর্ব্বলদৃষ্টির ভ্রম নহে, তাহা কি ঠিক করিয়া বলিতে পার?

আমি। আমার ভ্রম হইতে পারে—উষার ভ্রম হইতে পারে না।

তন্ত্র। কে উষা?

আমি। আমার স্ত্রী।

তন্ত্র। উনিও কি সে দাগ দেখিয়াছিলেন?

আমি। হাঁ, দেখিয়াছিলেন।

তখন তন্ত্ররত্নঠাকুর উষার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মুখে কোন প্রকার দাগ দেখিয়াছিলে?"

মুখ নত করিয়া উষা সম্মতি জানাইল।

তন্ত্ররত্ন বলিলেন, "কি প্রকারে?"

গলা ঝাড়িয়া অতি নম্র—অতি অস্পষ্টস্বরে উষা বলিল, "দর্পণে।"

পার্শ্বে চাহিয়া দেওয়াল-লম্বিত দর্পণ দেখিয়া তন্ত্ররত্নঠাকুর বলিলেন, "দেখ দেখি মা, সে দাগ এখনও আছে কি না?"

উষা সরিয়া গিয়া দর্পণ-প্রতিবিম্বে মুখ দেখিয়া জড়িত-নম্র-মৃদুস্বরে বলিল, "না।"

তন্ত্ররত্নঠাকুর কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন, তারপরে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ইঁহাদিগকে বাহিরে যাইতে বল। তোমার সহিত সমস্ত কথা বলিতেছি।"

আমি আদেশ করিলাম, আমার স্ত্রী ও ভগিনী বাহিরে চলিয়া গেল।

।।৫।।

চতুর্দ্দশ উল্লাস।

বিশ্লেষণ।

তখন তন্ত্ররত্ন ঠাকুর বলিলেন, "তোমার স্ত্রীর মুখে যে দাগ দেখিয়াছিলে, উহা কোন জীবিত মানবের মুখের চুম্বন-চিহ্ন নহে।"

আমি অধিকতর বিস্মিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে কি সত্য সত্যই কার্ত্তিকঠাকুরদা প্রেত হইয়া প্রতিহিংসা সাধনার্থে আমার স্ত্রীর গণ্ডে চুম্বন করিয়াছে ?"

তন্ত্র। না, তাও নয়। প্রেতদেহধারী মানবে তাহা পারে না।

আমি। তবে কিসের চিহ্ন ? আমার চক্ষুর দোষ বলিতে পারিবেন না। ঊষা নিজে সে চিহ্ন দেখিয়াছে।

তন্ত্র। তোমার চিন্তা-চিহ্ন ইচ্ছাশক্তির সহযোগে তোমার স্ত্রীর গণ্ডে ঐরূপ দাগ দেখাইয়াছিল। ইচ্ছাশক্তির সহযোগে চিন্তাশক্তির চালনায় অমন দাগ পড়া সহজ ও স্বাভাবিক।

আমি। আপনি ভ্রান্তবিশ্বাসে আমাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছেন।

তন্ত্র। কেন ?

আমি। যদিও আমি অবগত আছি, ইচ্ছা ও চিন্তাশক্তির বলে কেবল দাগ কেন মানুষের রূপ পরিবর্ত্তন হইতে পারে। জল জমিয়া বরফ হইতে পারে। আকাশে মেঘের সৃষ্টি হইতে পারে—অসাধ্য সাধন হইতে পারে। কিন্তু আমি কি চিন্তা করিয়াছিলাম যে, আমার স্ত্রীর গণ্ডে ঐরূপ কদর্য্য চিহ্ন হউক ?

তন্ত্র। সে চিন্তা কর নাই বটে, কিন্তু তোমার মনে প্রতিনিয়ত এখন এই চিন্তা যে, কার্ত্তিকবাবু প্রেত হইয়াছে, তোমাকে প্রতি-হিংসার আগুনে দগ্ধ করিবার জন্য—তোমাকে নিহত করিবার জন্য গাছে গাছে ফিরিতেছে। তোমার মনে হইতেছে, তুমি একজনের স্ত্রীকে কুপথে লইয়াছ, তোমার স্ত্রীকেও অপরে কুপথে লইবে। সেই উভয় প্রকার চিন্তা একত্র মিশিয়া কার্ত্তিকঠাকুরদা আর তোমার স্ত্রী নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। যে পরস্ত্রী-সঙ্গ ভালবাসে, পরনারীর প্রতি যাহার লোভ আছে, সে আপন বাড়ীর অন্দরের অর্গল সুদৃঢ় করিয়া থাকে। কেন না, তাহার চিন্তা—সে যেমন অনাবদ্ধ অর্গল-পথে পরের অন্দরে দৃষ্টিক্ষেপ করে, অপরেও তদ্রূপ করিবে। বৃক্ষের একটি শাখা ভাঙ্গিতে দেখিলে অপরটি যে ভাঙ্গিবে, তাহা নিশ্চয় জানা যায়। উত্তাপে উত্তাপে দুগ্ধ যেমন পরিমাণে অল্প হয়—গাঢ় হয়, কিন্তু শক্তি বাড়ে, চিন্তাও তেমনি পরিপাকে গাঢ় হয়, কিন্তু শক্তি বাড়ে। এখন তোমার জ্ঞান হইতেছে, তোমার স্ত্রী কার্ত্তিকবাবুর প্রেমে মজিবে। আমার বিশ্বাস, ক্রমে তুমি উহাই ভাবিতে ভাবিতে ক্ষেপিয়া উঠিবে। মৃত্যুকালে ঐ চিন্তাই তোমার বলবতী হইবে, এবং ঐ রজ্জু ধরিয়াই নরক-রাজ্যে প্রবেশ করিবে। মানুষের যাহা প্রাণের প্রধানতম ভাবনা, মৃত্যুকালে তাহারই সংস্কার প্রাণে বজায় থাকে।

আমি তন্ত্ররত্নঠাকুরের উপরে অত্যন্ত বিরক্ত হইলাম। তাঁহার সকল কথা বুঝিতেও পারিলাম না। নিস্তব্ধে উপাধানের উপর মাথা গুঁজিয়া শুইয়া থাকিলাম।

তন্ত্ররত্ন ঠাকুর ভারি চতুর। তিনি আমার ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, আমি তাঁহার কথা বিশ্বাস করিতেছি না। তখন তিনি বলিলেন, "আমার কথা বোধ হয়, তুমি বিশ্বাস করিতেছ না?"

আমি ক্লান্ত-করুণ অথচ বিরক্তিস্বরে বলিলাম, "না মহাশয়, আমি আপনার কথা বুঝিতেই পারিলাম না, তার বিশ্বাস করিব কি!"

তন্ত্র। এখন বুঝিতে পারিবে না। সময়ে পারিবে—কিন্তু তখন মনে থাকিবে কি?

মনে আছে। তন্ত্ররত্ন ঠাকুরের কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্য, তাহাও বুঝিয়াছি। তোমরাও আমার জীবনের ঘটনাবলীর আরও খানিক শুনিলে তাহা বুঝিতে পারিবে।

তখন কিন্তু আমি সে সকল বুঝিলাম না। বিরক্তিস্বরে বলিলাম, "মহাশয়, ও সকল বাজে কথা ছাড়িয়া দিন। আপনি যে জন্য আসিয়াছেন, তাহার কি বলুন?"

তন্ত্র। আমি তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিব না।

আমি। আমাকে আরোগ্য করিতে পারিবেন না?

তন্ত্র। না।

আমি। তবে আর অন্য কথায় কাজ নাই।

তন্ত্র। তোমার দেহে যদি কোন আত্মিক-আবেশ হইত, তাহা হইলে আমি আরোগ্য করিতে পারিতাম।

আমি। আমার তবে এ কি?

তন্ত্র। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি—তোমার চিত্ত-বৃত্তি কার্ত্তিকবাবুর হত্যা-ব্যাপারে তদাকারপ্রাপ্ত হইয়া নরক-সৃষ্টি করিতেছে। দুষ্ক্রিয়ার বা সুক্রিয়ার চিত্ত তদাকার প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গ বা নরক সৃষ্টি করিয়া লয়। আর নিষ্কামকর্ম্মে স্বর্গ-নরক কিছুই সৃষ্টি করিতে না পারিয়া কাজেই মানুষকে মুক্তির পথে ছাড়িয়া দেয়।

আমি। ইহার শেষ ফল কি বলিতে পারেন?

তন্ত্র। কিসের শেষ ফল?

আমি। আমার এই পাপ-চিন্তার ?

তন্ত্র। নরক-সৃষ্টি।

আমি। বুঝিতে পারিলাম না। কোথায় নরক সৃষ্টি ?

তন্ত্র। তোমার চিত্ত ঐ পাপকার্য্যরূপ বিষয়াবলম্বনে তদাকার প্রাপ্ত হইয়াছে। কাজেই তোমার চিত্ত এখন নরকময়। সম্মুখে ওটা কি ?

তন্ত্ররত্ন অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেওয়াল-লম্বিত ঘড়ীটা দেখাইলেন। আমি বলিলাম, "ঘড়ী।"

তন্ত্র। ইংরাজেরা উহাকে কি বলে ?

আমি। ওয়াচ।

তন্ত্র। তবে উহার প্রকৃত নাম কি ?

আমি। প্রকৃত নাম আবার কি ? দুই নামই প্রকৃত। দেশভেদে ভাষা ভেদ।

তন্ত্র। আমি যদি উহাকে সামলা বলি ?

আমি। শীঘ্র সকলে বুঝিতে পারে না। কিন্তু যাহারা শোনে আপনি ঘড়ীকে সামলা বলেন, ক্রমে তাহারা সামলা বলিলে ঘড়ী বুঝিয়া লইতে পারে।

তন্ত্র। তবেই ধর, ঘড়ী, ওয়াচ বা সামলা বলিয়া কোন বস্তু নাই। নাম কিছুই নহে। চিত্ত তদাকার প্রাপ্ত হইয়াই তাহার জ্ঞান মনের নিকট পঁহুছিয়া দেয়। তাহার জ্ঞান মনের নিকটে উপস্থিত হইলে তৎসম্বন্ধীয় সুখ-দুঃখ উপস্থিত হয়। মনে কর, গোল্যাপ, রোস বা গোলাপের যে নামই তোমার কাণের কাছে উপস্থিত হয়, কাণ বা শ্রবণেন্দ্রিয় সেই ধ্বনি মনের নিকটে পঁহুছিয়া দেয়। মনে তখন জ্ঞান জন্মে—চিত্ত গোলাপের আকার, গন্ধ ও সর্ব্বপ্রকার গুণের ভাবে পরি-

তন্ত্ররত্ন ঠাকুরের শব-সাধনা।   ৭৭ পৃঃ।

গত হয়। তখন চিত্তই গোলাপাকার প্রাপ্ত হয়। গোলাপ ব্যবহারের সুখ-দুঃখে তখন চিত্ত অভিভূত হয়। কার্ত্তিকবাবু খুন হইয়াছে—সেই খুনের অবস্থা, যন্ত্রণা ও সর্ব্বপ্রকার ভাব তোমার চিত্তে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে প্রতিফলিত হইয়াছে। তোমার চিত্ত এখন তদাকারপ্রাপ্ত হইয়াছে। সন্ধ্যার প্রেম পাপজনক, ইহা তুমি জান—তোমার স্ত্রীও যা, সন্ধ্যাও তা—এ কথাও জান। সন্ধ্যা পাপে মজিয়াছে—অসতী হইয়াছে, ঊষাও অসতী হইতে পারে, এই ধারণা উপস্থিত হইয়াছে। ক্রমে এখন তোমার চিত্ত তদাকার হইয়াছে। কার্ত্তিকবাবু যেমন দুঃখ পাইয়া গিয়াছে, তুমিও এখন তেমনই দুঃখে নিয়ত দুঃখিত রহিয়াছ। দুঃখই নরক, মৃত্যুর পরে ঐ নরকের বিকাশ আরও অধিক হইবে। তখন দীর্ঘ দিবস ধরিয়া এই নরকোৎসবে যোগ দিয়া অতিবাহিত করিতে হইবে।

আমি কোন কথা কহিলাম না। ইহার অল্পক্ষণ পরে নীলুখুড়ো আসিলেন এবং তন্ত্ররত্নঠাকুরকে ডাকিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন।

পর দিবস হইতে তন্ত্ররত্নঠাকুর অনেক হোম-যজ্ঞ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে আমার কোন উপকার হয় নাই। বাবার নিতান্ত অনুরোধে তন্ত্ররত্ন শ্মশানে গিয়া শবসাধনা করিয়া শবের মুখে সংবাদ লইয়াছিলেন, আমার রোগ সারিবে না। ইহার কয়েকদিন পরে অনেকগুলি টাকা লইয়া তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন।

পঞ্চদশ উল্লাস।

চিন্তাস্রোত।

আমার রোগ আরোগ্য হইল না। আমি আর উঠিতে পারিলাম না। শরীরের রক্ত জল হইয়া গেল, মাংস উপিয়া গেল। রহিল কঙ্কাল আর চর্ম্ম। আমাকে তখন যে দেখিত, সেই চমকিয়া উঠিত।

আমার মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে লাগিল। প্রত্যহ জ্বর হইতে লাগিল। ক্রমে জ্ঞানও লোপ পাইয়া আসিতে লাগিল। এক একদিন দিবসের অধিকাংশ সময়ই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকিতাম। কোন কোন সময় জ্ঞান হইত। যখন জ্ঞান হইত, তখন বুঝিতে পারিতাম, আমি এত সময় অজ্ঞান ছিলাম।

ঐ অজ্ঞান-অবস্থা দুই প্রকারে হইত। একপ্রকার বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বিরহিত হইয়া যাইত। আমি কে, বর্ত্তমানে আমার অবস্থা কি, এ সকল জ্ঞান থাকিত না। কেবল সেই অজ্ঞানতার মধ্যে সন্ধ্যা, ঊষা, কার্ত্তিকঠাকুরদা আর আমি নানাবিধ লীলা-ক্রীড়া করিতাম।

যখন জ্ঞান হইত, তখন অবশ্য বুঝিতে পারিতাম, উহা সত্য নহে, স্বপ্ন বা অজ্ঞান-অবস্থার দৃশ্য; কিন্তু যন্ত্রণা যাইত না। বালক যেমন দর্পণস্থ আত্মবিম্বের সহিত ক্রীড়া করে, ঝগড়া করে, মুখ ভাঙায়, প্রহার করিতে উদ্যত হয়, আমিও তখন তেমনি আপন মনের সংস্কার লইয়া হাসিতাম, খেলিতাম, কাঁদিতাম—যন্ত্রণা সহ্য করিতাম।

ঐ অজ্ঞান-অবস্থায় কি দেখিতাম, তাহাও তোমাদিগকে বলি। প্রতিদিন এক প্রকার নহে। কোনদিন দেখিতাম, কার্ত্তিকঠাকুরদাকে

খুন করিয়া ধরা পড়িয়াছি। রাজদ্বারে বিচার হইল, বিচারে আমার ফাঁসির আদেশ হইল—ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিলাম—গলদেশে ফাঁসি উঠিল। বিকট যন্ত্রণায় ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিলাম। কেহ রক্ষা করিল না—নিবারণ করিল না—মুখের কথা শুধাইল না। ফাঁসি আরও জোরে গলায় চাপিল—যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম। কোনও দিন বা দেখিতাম, কার্ত্তিকঠাকুরদা ভূত হইয়া আমায় খুঁজিয়া ফিরিতেছে। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাকালে দেখা পাইয়া চাপিয়া ধরিল। আমার সম্মুখের মুণ্ড ঘুরাইয়া পশ্চাদ্দিকে বাঁকাইয়া দিল—সে যে কি যন্ত্রণা, তোমরা বুঝিবে কি প্রকারে? কোনদিন বা দেখিতাম, কার্ত্তিকঠাকুরদা কোন নিশীথ রাত্রে ঘোর অন্ধকারে তাহার মৃত্যু-শীতল প্রেত-মুষ্টিতে আমার দুই পা চাপিয়া ধরিয়া অশ্বত্থবৃক্ষের পুরাতন কাণ্ডে আছড়াইয়া মারিতেছে। আমার মুখ দিয়া রক্ত বমন হইতেছে। সর্ব্বাঙ্গ গুঁড়া হইয়া যাইতেছে। কত নরনারী সে স্থান দিয়া গমনাগমন করিতেছে, আমার ঐ দুরবস্থা দেখিয়া কেহ মুখের কথাও বলিতেছে না, প্রহারে বাধা দিতেছে না। কোনদিন বা দেখিতাম, সন্ধ্যার সহিত যেন গোপনে রহস্যালাপ করিতেছি, এমন সময় এক লৌহ-পুরুষ আসিয়া আমাদের উভয়কে ধরিয়া লইয়া বিমান-মার্গে চলিয়া গেল, এবং তথা হইতে পৃথিবী-বক্ষে ফেলিয়া দিল। পৃথিবীতে নরকের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল। সন্ধ্যা ও আমি শূন্য—মহাশূন্য—ধূ ধূ নিরাশ্রয়—শূন্যপথে কক্ষবিচ্যুত যুগ্ম গ্রহের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া সেই নরকাগ্নি মধ্যে পড়িয়া গেলাম। ভীষণ অগ্নিতাপে গলিয়া পুড়িয়া মিশিয়া গেলাম। যন্ত্রণা—বলিবার নহে, বুঝাইবার নহে।

কোনদিন বা দেখিতাম, উষা পরপুরুষের অঙ্কশায়িনী হইয়াছে। স্ত্রী পরপুরুষের অনুগামিনী হইলে যে, কত যন্ত্রণা, তাহাতে অনুভব করিতে

পারিতাম। হৃদয় চিরিয়া যাইত, প্রাণ ধসিয়া পড়িত—কেহ সাহায্য করিবার লোক ছিল না। চক্ষুর জল নিবারণ করিবার উপায় করিতে পারিতাম না। উষাকে সুপথে আনিবার কোন পন্থা মিলিত না। মনে হইত, অন্য লোকের প্রণয়প্রার্থিনী উষাকে সুপথে আনিয়া কি হইবে! কিন্তু প্রাণ ধসিয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইত। এইরূপ নিত্য নূতন নূতন যন্ত্রণায় দিন কাটিত।

অপর প্রকার অজ্ঞান অবস্থা যাহা, তাহার কিছুই আমার মনে থাকিত না। কোন দৃশ্য দেখিতাম কি না, কোন ভাব অনুভব করিতাম কি না; তাহা মনে থাকিত না। তবে অজ্ঞান হইতাম—অজ্ঞান থাকিতাম, তাহা মনে থাকিত।

এইরূপে ছয় মাস কাটিয়া গেল। এ পর্য্যন্ত সন্ধ্যা আর আমার নিকটে আইসে নাই।

ষোড়শ উল্লাস।
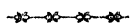
দূতী সংবাদ।

গ্রীষ্মকাল আসিল। দারুণ উত্তাপে পৃথিবী উত্তপ্তা—মধ্যাহ্ন-বাতাসে যেন আগুনের হল্কা বহিয়া যাইতে লাগিল। আম, জাম, কাঁঠাল, লীচু, পীচ, পিয়ারা পাকিয়া উঠিল। আমার শরীর সেই গরমে যেন একটু আরোগ্যের পথে গেল। আমি শয্যা ছাড়িয়া উঠিলাম, একটু-আধটু চলিয়া-ফিরিয়াও বেড়াইতে পারিতাম।

একদিন সন্ধ্যার বাড়ীর এক দাসী আমাকে দেখিতে আসিল।

তাহাকে দেখিয়া ঘৃণা হইল, সে আমার সম্মুখে না আসিলেই যেন আমার পক্ষে ভাল হইত। সন্ধ্যার কথা মনে আসিলেই কার্ত্তিক-ঠাকুরদার কথা মনে পড়িত। কার্ত্তিকঠাকুরদার কথা মনে হইলেই তাহার প্রেতমূর্ত্তি দেখিতে পাইতাম, নতুবা সে সময় আগেকার মত সর্ব্বদা দেখিতাম না।

আমার পিতার পূর্ব্ব হইতেই কিছু ঋণ ছিল, সেই ঋণের সংখ্যা ক্রমে দশ হাত ঘুরিয়া-ফিরিয়া এখন অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়িয়াছিল।

তিনজন কাঠের মহাজনে প্রায় পনর হাজার টাকা পাইত, আর বাজার দেনাও প্রায় সাত আট হাজার টাকা হইয়াছিল। ক্রমে মহাজনেরা ধারে কাঠ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, ক্রমে এক এক করিয়া তাহারা নালিশ দিয়া ডিক্রী করিয়াছিল—ক্রমে সকলের তাগাদায় বাবার বাড়ী তিষ্ঠান দায় হইয়াছিল, আমাদের আহারাদিরও কষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

সন্ধ্যার দাসীকে দেখিয়া আমার মনে ঘৃণা ও ক্রোধের উদ্রেক

হইলেও বাহিরে তাহা প্রকাশ করিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার মনিবঠাকুরাণী কেমন আছে?"

দাসী একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। সেখানে অপর কেহ নাই দেখিয়া বলিল, "আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। আপনাকে একটা কথা বলিবার জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি। আমার সহিত আপনার আর দেখা হইবে না। আমি দেশে যাইব।"

তাহার বাড়ী মেদিনীপুর জেলায়। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাকে জবাব দিল কেন?"

দাসী। সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি। আপনি যেদিন ওবাড়ী হইতে শেষ চলিয়া আসেন, আপনার মনে হয় কি, আমার নিকটে কিছু রাখিতে দিয়াছিলেন?

আমি চেষ্টা করিয়াও স্মরণ করিতে পারিলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলাম, "কৈ, কিছুই ত মনে করিতে পারিতেছি না।"

দাসী। একটা আংটী—কাত্তিকবাবুর নাম খোদাই করা আংটী আপনার আঙুল গলিয়া পড়িয়া গেল, আপনি আমার হাতে দিলেন। বলিলেন, তুলিয়া রাখ। আমি রাখিয়াছিলাম——

আমি। হাঁ, মনে হইয়াছে—সত্যই দিয়াছিলাম। তার পর?

দাসী। শ্যামবাবু আমার কাছে সেই আংটী চান। আমি একবার কেবল বলিয়াছিলাম, তিনি রাখিতে দিয়াছেন, আপনাকে দিব কেন? এই অপরাধে শ্যাম বাবু আমাকে লাথি মারিলেন। বৌঠাকুরাণী জবাব দিয়া দিলেন।

আমি। শ্যাম বাবু কে?

দাসী। বাড়ীর সরকার।

আমি। ওঃ—মনে হইয়াছে। শ্যাম বিশ্বাস। সে, সে আঙটী

তোমার হাতে কি প্রকারে দেখিল ? সে ত বাহিরে থাকে, খাতাপত্র লেখে, বাজার করে—তাগাদাপত্র করে—এইমাত্র। কখনও বাড়ীর মধ্যে আসে না, তবে আঙটী দেখিবে কেমন করিয়া ? বাড়ীর মধ্যের ঘটনা সে অবগত হইবে কি প্রকারে ?

দাসী চোখ ঘুরাইয়া অবজ্ঞার স্বরে বলিল, "সে-ই আ'জ-কা'ল বাড়ীর কর্ত্তা। সে-ই আ'জ-কা'ল বাবু—সে-ই আ'জ-কা'ল বৌঠাকু-রাণীর প্রিয়তম।"

আমার ধমনীগুলা দেহের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল, রক্তহীন শিরাগুলা কিঞ্চিৎ ফুলিয়া উঠিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ কথা কহিতে পারিলাম না। তারপরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া দাসীকে বলিলাম, "তোমার কথা কি সত্য ?"

দাসী। আমি মিথ্যা বলি নাই, মিথ্যা বলিবার কোন হেতুও নাই।

আমি। সে আংটী এখন কোথায় ?

দাসী। লাথি খাইয়া আংটী তাঁহাদের নিকট ফেলিয়া দিয়াছিলাম, শ্যামবাবু তাহা হাতে দিয়াছেন।

আমি। শ্যাম বাবু কি এখন সন্ধ্যার ঘরেই থাকে ?

দাসী। হাঁ, যে চৌকিতে আপনি বসিতেন, শ্যামবাবু এখন সেই চৌকিতে বসেন। যে খাটে আপনি শুইতেন, শ্যাম বাবু সেই খাটে শুইয়া থাকেন। ফল কথা—গাড়ী, ঘোড়া, দাস, দাসী—এ সকল আপনি যেমন ভাবে ব্যবহার করিতেন, শ্যাম বাবু তাহাই করিতেছেন।

আমার অত্যন্ত রাগ হইল। দুর্ব্বল শিরাগুলা কাঁপিয়া উঠিল, আমি পড়িয়া যাইতেছিলাম। একটু সামলাইয়া লইয়া দাসীকে বলিলাম, "সে শালা কুকুর কি জানে না যে, বিষয়-সম্পত্তি গাড়ী-ঘুড়ী ঘর-বাড়ী সব আমার—সন্ধ্যার নয়।"

দাসী বলিল, "দুই-একদিন সে কথা হইয়াছিল, কিন্তু শ্যাম বাবু বলেন—শ্যামাচরণ যখন সন্ধ্যার পক্ষে দাঁড়াইয়াছে, তখন কাহার সাধ্য এ সম্পত্তি আর লইতে পারে!"

আমি। সন্ধ্যা কিছু বলিয়াছিল?

দাসী। হাঁ, তিনি বলিয়াছিলেন—আমি যে মরিয়াছি, তাহাকে দানপত্র লিখিয়া দিয়াছি—কি করিয়া ফিরাইবে?

আমি। শ্যামাচরণ তার উত্তরে কি বলিয়াছিল?

দাসী। তিনি বলিলেন, সে দানপত্র গ্রাহ্যের মধ্যেই আসিবে না। সেটা বেনামী বলা যাইবে। কেন না, দানপত্র লেখার পরে সম্পত্তি তোমারই অধিকারে ও দখলে আছে। যদিও কিছুদিন তোমার বাড়ী থাকিয়া তিনি ভোগ-দখল করিয়াছেন বটে, কিন্তু তারপর? তারপর তুমি তাড়াইয়া দিয়াছ—তিনি বেদখল হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। আর কেন?

আমি সে কথা শুনিয়া চিন্তিত হইলাম। রাগও অত্যন্ত হইল, দাসীকে বিদায় দিয়া বাবাকে ডাকাইলাম।

সপ্তদশ উল্লাস।

অবস্থান্তর।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমি আমার শয়নপ্রকোষ্ঠের বাহিরে খোলা বারেণ্ডায় একটা মাদুরের উপরে শয়ন করিয়াছিলাম। বারেণ্ডার নিম্নে রাজপথ, রাজপথের আলোকস্তম্ভ হইতে গ্যাসের আলোক আসিয়া সে বারেণ্ডা আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল, এবং রাজপথ দিয়া বেলফুল বিক্রেতা "চাই বেলফুল" হাঁকিয়া চলিয়া যাইতেছিল।

নৈদাঘী সন্ধ্যার শীতল বাতাস বেশ সুখকর জ্ঞান হইতেছিল, আমি মাদুরের উপর পড়িয়া অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের ভাবনা ভাবিতেছিলাম।

মনে মনে নানাবিধ চিন্তা করিতেছিলাম, কিন্তু চক্ষু চাহিয়া বাহিরের দিকে চাহিতে পারিতাম না। চাহিলে প্রায়ই কার্ত্তিকঠাকুরদার প্রেতমূর্ত্তি আমার নয়নপথের পথিক হইত। সে বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি যেদিন দেখিতাম, সেইদিনই আমার অসুখ বৃদ্ধি হইত। একে দুর্ব্বল দেহ—সে মূর্ত্তি দেখিলে আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িত—আরও অসুখ করিত।

সহসা কাহার পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম। পায়ের শব্দ শুনিলেও আমি হঠাৎ সেদিকে চাহিতাম না। কত দিন এমন ঘটিয়াছে যে, কোন শব্দ শুনিয়া সেদিকে যেমন চাহিয়াছি, আর অমনি কার্ত্তিক-ঠাকুরদার প্রেতমূর্ত্তির বিকট দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে কাঁপিয়া মরিয়াছি। আমি চাহিলাম না, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই বাবা আসিয়া আমার শিয়রে দাঁড়াইয়া আমাকে ডাকিলেন।

বাবার গলার স্বর শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম, এবং বালিসে ভর করিয়া একটু উঁচু হইয়া বসিলাম। বাবাও মাদুরের এক কোণে বসিয়া পড়িলেন, আমি ব্যগ্রোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হইল ?"

বাবা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "এক রকম হয়, কিন্তু——"

আমি। কিন্তু কি বাবা ?

বাবা। কিন্তু ঋণের দায়ে—অর্থের দায়ে আমাকে মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতে হয়।

আমি। কেন, আপনার মনুষ্যত্ব কিসে যাইবে ? আপনার উহাতে কি সম্পর্ক আছে ?

বাবা। মানুষের চক্ষুতে ধূলি দিতে পারিব—মানুষকে দেখাইতে পারিব—আমি উহাতে নই ; যা একটু যাতায়াত করিতেছি, তোমার জন্য। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে ; আমার নিজের জন্যে—আমার নিজের ঋণ পরিশোধের জন্যে—নিজের সংসারের স্বাচ্ছন্দ্য ফিরাইয়া আনিবার জন্যে—পুত্রের পাপার্জ্জিত অর্থ গ্রহণ করিবার জন্যে পাপ-কার্য্যে রত হইতেছি। ভগবান ইহা দেখিতেছেন—তাই হৃদয়ের মধ্যে পড়িয়া বিবেক বস্তুটা বড় কান্নাকাটি করিতেছে।

আমি। কিন্তু উপায় নাই। মহাজনেরা বাড়ীখানি দখল করিবে, দোকানপাট বিক্রয় করিয়া লইবে—বাজারে দুর্নাম রটিবে—আহার পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যাইবে।

বাবা। তাই বলিয়াই বড় অনিচ্ছাসত্ত্বে—বড় ধীরে ধীরে—বড় দুঃখিতান্তঃকরণে পাপ-পথে অগ্রসর হইতেছি।

আমি। এটর্ণির বাড়ী গিয়াছিলেন ?

বাবা। গিয়াছিলাম।

আমি। তিনি কি বলিলেন ?

বাবা। তাঁহার এক মক্কেলে তোমার নামীয় সন্ধ্যার দেওয়া দান-পত্র কিনিয়া লইতে স্বীকৃত আছেন। মামলা-মোকদ্দমা করা, দখল লওয়া বা যাহা কিছু করিবার প্রয়োজন তিনিই করিবেন। তোমাকে ঐ দানপত্রের মূল্য পঁচিশ হাজার টাকা দিতে চাহেন।

আমি। মোটে পাঁচিশ হাজার টাকা! বড়বাজারের পচাগলিতে যে একখানা বাড়ী আছে, তাহারই মূল্য অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা। কিছু না হইবে, সন্ধ্যার সম্পত্তির মূল্য তিন লক্ষ টাকা।

বাবা। এটর্ণি বলেন, মামলা-মোকদ্দমা করিয়া যদি না পাওয়া যায়, তবে ঐ ভদ্রলোকের প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা লোকসান হইবে, কারণ এই পঁচিশ হাজার—আর মামলা-মোকদ্দমা করিতে কোন্ পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় না হইবে। এখন অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া এই পঞ্চাশ হাজার জলে ফেলা!

আমি। আপনি কি বলিয়া আসিলেন ?

বাবা। ত্রিশ হাজার।

আমি। তাঁহারা কি বলিলেন ?

বাবা। যুক্তি করিয়া যাহা হয়, কা'ল সংবাদ দিবেন।

আমি। যদি হয়, ঐ পথই ভাল। আমরা যে মোকদ্দমা করিয়া সম্পত্তি দখলে আনিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এখন আমরা এক পয়সার কাঙ্গাল। বিশেষতঃ আপনি প্রকাশ্যে ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন কাজেই অগ্রসর হইতে পারিবেন না।

বাবা। না বাবা, তা আমি কখনই পারিব না। অমন কুকর্ম্মার্জ্জিত অর্থপ্রাপ্তির জন্য আমি প্রকাশ্য চেষ্টা কখনই করিতে পারিব না।

আমি। আমারও জীবন-প্রদীপ নিবিয়া আসিয়াছে—বাঁচিবার

আশা কিছুমাত্র নাই। সে প্রেত আমার পশ্চাৎ লাগিয়াই আছে, ধ্বংস না করিয়া ছাড়িবে না। তবে একটু যে সুস্থজ্ঞান করিতেছি, ইহা প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের গুণে। কবিরাজও বলিতেছিলেন, অত্যন্ত গরমে একটু অবস্থান্তর হইয়াছে, আগামী হেমন্ত ঋতুতে জীবনের আশা কম হইবে। বাবা, হতভাগ্য পুত্র আপনার কোন উপকারই করিতে পারিল না। এই হতভাগ্যের পড়াশুনার খরচ যোগাইতে, অবস্থার অতীত পোষাক-পরিচ্ছদ কিনিয়া দিতে আপনি ঋণগ্রস্থ হইয়াছেন—পাপ-পুণ্য যেমন করিয়াই হউক, যদি এই পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকা এ সময় আপনাকে দেওয়াইতে পারি, জীবনে একটু শান্তি পাইব।

বাবা। এ টাকা না মিলিলেই আমার মনে অধিক শান্তি থাকিত। আমি পুত্রকে সযত্নে লালন-পালন করিয়াছি—বহু কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছি—ন্যায়ার্জ্জিত অর্থ সাহায্য করিয়া পুত্র আমার উপকার করিবে—তাহা সুখের, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে এ কি সাহায্য? পাপ-পথের পথিক হইয়া পুত্রের আয়ু-সূর্য্য অকালে অস্তমিত-প্রায়। পাপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা সে আমাকে সাহায্য করিতে উদ্যত। আর আমি হতভাগ্য—ভাগ্যচক্রের নিষ্পেষণে পড়িয়া সেই অর্থ গ্রহণে উদ্যত, সেই ঘৃণিত কার্য্যে পুত্রের সাহায্য করিয়া ফিরিতেছি।

আমি। আপনি তজ্জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। উহাতে যদি কোন পাপ থাকে, তবে তাহা আমার—কিছুমাত্র পাতক আপনাকে স্পর্শ করিবে না।

বাবা। না বাবা, তাহা হয় না। যে যেমন কর্ম্ম করিবে,সে তেমনই ফলভোগ করিবে। কেহ কাহারও কর্ম্মফল গ্রহণ বা প্রদান করিতে পারে না। আমি পলতা চর্ব্বণ করিলে, তুমি যদি বল উহারে তিক্তাস্বাদ

আমারই হইবে—তাহা কি হইতে পারে? তোমাকে অহিফেণ সেবন করাইয়া আমি যদি বলি, মত্ততা আমার হইবে—তাহাই কি হয়? আর যদি তোমারই পাপ হয়—তাহাতেও আমি সুখী হইব না। যেমন ইহকাল আছে, তেমনি পরকাল আছে—পরকালে পাপ-পুণ্যের ভোগ আছে। তুমি আমার প্রাণতম পুত্র—তোমার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ। পরলোকের পথে তুমি সত্বরেই গমন করিবে—এ সময় তুমি আরও পাতক সংগ্রহ কর—ইহা আমার ইচ্ছা নহে।

বাবার গলার স্বর ভার হইয়া আসিল, আমার বোধ হইল, বাবা কাঁদিতেছেন। আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না—কেন না, বাবা তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। গলা ঝাড়িয়া বলিলেন, "দেখা যাক্, কা'ল কি সংবাদ আসে।"

বাবা চলিয়া গেলেন।

তখন আমি একা। বাহিরের বাতাস হু-হু করিয়া বহিয়া যাইতেছিল, মেঘশূন্য নির্ম্মল নীলআকাশে অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলিতেছিল—আমি একা।

একা শুইয়া ভাবিতেছিলাম, বাবা বলিলেন, তোমার জীবন-দীপ নিবিয়া আসিল, সত্বরেই তোমাকে পরলোকের পথে গমন করিতে হইবে—এ সময় পাতক সঞ্চয় কর, এমন ইচ্ছা আমার নয়। পরলোক আছে, কর্ম্মফল আছে।

তখন আমি একা হইব। আসিয়াছি একা, যাইব একা। এখানকার যন্ত্রণা নিবারণ জন্য ভগিনী, মাতা, পিতা, ভ্রাতা ও দাসদাসী এবং চিকিৎসকমণ্ডলী সর্ব্বদাই সচেষ্ট; কিন্তু সেখানে কে আছে?

অনন্ত ধূ ধূ আকাশ চক্ষুর সম্মুখে পড়িয়াছিল। সে তাহার নীরব ভাষার নীরব কাহিনীতে যেন বলিতেছিল—না, কেহই নাই। তুমি একা। সবাই একা একা।

উঃ! ভাবিতে প্রাণ শিহরিয়া উঠে! বাবা এই সামান্য পাপের জন্য ভীত হইতেছেন, তাঁহার হতভাগ্য পুত্র পরলোকে কষ্ট পাইবে ভাবিয়া বিচলিত হইতেছেন. কিন্তু হায়! তিনি জানেন না যে, তাঁহার হতভাগ্য পুত্র কত নরক হৃদয়ে পুষিতেছে! কত পাপের ভীষণ অনল তাহার হৃদয়মধ্যে দিবারাত্রি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে!

আমার চক্ষুকোণ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। দুর্ব্বল শরীর আরও দুর্ব্বল হইল।

হায়, আমি কি করিয়াছি! ইহলোকে অবস্থানের এই কয়টা দিন কত পাপেই অতিবাহিত করিয়াছি! মায়ার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া কি নরকই ডাকিয়া আনিয়াছি!

পরস্ত্রীহরণ! ইহা কি খুব গুরুতর পাপ? কেন পাপ? কত দেশের মানব ইহা ত কোন অকর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যেই গণ্য করে না! যাহাতে অপর দেশে কিছুমাত্র দোষ হয় না, তাহাতে আমাদের দেশে অসীম নরক—অনন্ত মহাপাতক হইবে কেন?

বুঝিতে পারিতেছিলাম না—সে কথার মীমাংসাই হইতেছিল না। কিন্তু প্রাণের যন্ত্রণা নিবারণ হইল না। কেমন যেন এক প্রকার অননুভূত যন্ত্রণা প্রাণের সমস্ত গাত্রে মাখিয়া গেল। উঠিবার সাধ্য ছিল না, কোথাও চলিয়া যাইবার ক্ষমতা ছিল না, কাজেই সেই বিছানার উপরে পড়িয়া সে যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিলাম।

তখন আমি একা, শূন্য ধূ ধূ নক্ষত্রোজ্জ্বল আকাশের দিকে চাহিলাম—কেহ কোথাও ছিল না। সম্মুখের বাড়ীর ছাদের উপর একটা ধূম জড়াইয়া জড়াইয়া পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতেছিল। আশ্চর্য্য হইয়া সেদিকে চাহিলাম।

সে ছাদে লোক ছিল না। ধূমরাশি কাঁপিয়া কাঁপিয়া দীর্ঘাকার

ধারণ করিল। দেখিতে দেখিতে ধূমরাশি ভেদ করিয়া কার্ত্তিকঠাকুরদার অনলমূর্ত্তি বাহির হইল।

ভীষণ হইতে ভীষণতর! কার্ত্তিকঠাকুরদার কোলের কাছে ঊষা! উভয়ে প্রেমসম্ভাষণে সহাস্যমুখ!

আমার প্রাণের মধ্যে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। প্রাণের মধ্যে অনির্ব্বচনীয় যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলাম। সে যন্ত্রণার উপমা নাই, তুলনা নাই,—আমি চীৎকার করিতে যাইতেছিলাম। কিন্তু সেই ধূমরাশি আবার কাঁপিয়া উঠিল—ধূমরাশির মধ্যে সেই মূর্ত্তিযুগল মিশাইয়া গেল। আমি বুঝিলাম, ঐ মূর্ত্তিদ্বয় অবাস্তব—প্রেতমূর্ত্তি! কিন্তু তথাপি প্রাণের যন্ত্রণা গেল না। ঊষা যে বাস্তবিক অসতী নহে, ঐ দৃশ্য অবাস্তব—তাহা বেশ বুঝিতেছিলাম, কিন্তু তথাপিও প্রাণে যেন শান্তি পাইলাম না।

তখন মনে হইল, পরদারহরণে মহাপাতক হয় কেন? কার্ত্তিকঠাকুরদা আর ঊষার অবাস্তব মূর্ত্তি একত্রে দর্শন করিয়া আমার প্রাণে এই অসীম যন্ত্রণা উপস্থিত হইল, আর যাহার স্ত্রী অসতী—সত্য সত্য যে আপন স্ত্রীকে অপরের অনুগামিনী দর্শন করে, তাহার প্রাণে কত যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। যাহাতে অপরের প্রাণে জ্বালা উপস্থিত হয়, অপরের প্রাণে আঘাত লাগে—প্রকৃতপক্ষে তাহাই মহাপাতক। কারণ, আত্মা এক—আমার কৃতকার্য্যে যদি অপরের মনে সুখ হয়, তবে আমার প্রাণে নিশ্চয়ই সুখের হিল্লোল বহিতে থাকে। আর যদি আমার কার্য্যে অপরের চক্ষুতে জল আসে, তবে আমার চক্ষুও জল না পড়িয়া থাকিতে পারে না। অপর দেশের লোকের স্ত্রী বা ভগিনী অসতী হইলে তাহাদের মনে তাদৃশ দুঃখ হয় না, কাজেই সে দেশের লোকে পারদারিক হইলেও পাতক তাদৃশ হয় না। আমাদের দেশের

লোক উহাতে বড় কষ্ট পায়, কাজেই আমাদের দেশের লোকের উহাতে পাতকও অধিক হয়।

তারপরে কত কথা মনে আসিল। হৃদয়মধ্যে কত চিন্তা উদয় ও বিলীন হইল। ক্রমে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

অষ্টাদশ উল্লাস।

ঊষার অর্চ্চনা।

তখন গ্রীষ্ম গিয়াছে—বর্ষা আসিয়াছে। বর্ষাগমে জলদজাল আকাশপথ ছাইয়া বসিয়াছে।

সেদিন সকাল হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। জলে রাজপথ পূরিয়া গিয়াছে—গাড়ী-পাল্কী চলাচল এক প্রকার বন্ধ। দিবা দশটা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বাবা স্নানাহার সমাপ্ত করিয়া বাহিরে যাইবার কাপড়-চোপড় পরিধান করতঃ আমার নিকট আগমন করিলেন।

আমি তখন গৃহমধ্যে পালঙ্কের উপর শয়ন করিয়াছিলাম। অত্যন্ত বর্ষায় আমার শরীর আবার ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

বাবার হাতে একখানা কাগজ ছিল। আমার সন্নিকটে আসিয়া সেখানা পাঠ করিয়া আমাকে শুনাইলেন।

তাহাতে যাহা লেখা ছিল, তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এইরূপ—

আমি সন্ধ্যার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি যাহা দানপ্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা এক লক্ষ টাকায় ঠাকুরপ্রসাদ সিংকে বিক্রয় করিতেছি।

দলিলে লেখা লক্ষ টাকা, কিন্তু তিনি আমাদিগকে দিবেন, ত্রিশ হাজার টাকা।

দলিল পাঠ সমাপ্ত করিয়া বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠিক হইয়াছে ?"

আমি। ত্রিশ হাজার টাকার সহিত আমাদের সম্বন্ধ। তদ্ভিন্ন তাহাদের যাহা ইচ্ছা, তাহাই লেখাইয়া লইতে পারে।

বাবা। আজ বিকালে বোধ হয়, উকিল, এটর্ণি ও রেজিষ্টার আসিয়া তোমার স্বাক্ষর এবং সম্মতি লইয়া যাইবে।

আমি। আপত্তি নাই, তবে টাকাগুলা আপনি ঐ সঙ্গেই লইবেন। যেন কা'ল দিব বলিয়া দলীল সম্পাদন করিয়া না লয়।

বাবা। না, তাহা হইবে না। টাকা তোমার সম্মুখেই লইব। এখন বৃষ্টি থামিলে হয়। এ ছাই কাজ লইয়া আর ঘুরা-ফেরা ভাল লাগে না। আজ প্রায় এক মাস ধরিয়া এই কাজে লিপ্ত আছি।

আমি তদুত্তরে আর কিছু বলিলাম না, বাবা চলিয়া গেলেন। ইহার কিয়ৎক্ষণ পরে বৃষ্টি থামিয়া গেল, কিন্তু রৌদ্র উঠিল না। সূর্য্যদেব তখনও মেঘে চাপা থাকিলেন।

উষা বোধ হয়, শিবমন্দিরে শিবপূজা করিতে যাইতেছিল। আমাদের বাড়ীর পার্শ্বেই মাধববাবুদের বাণেশ্বর শিবের মন্দির। আমার আরোগ্যকামনায় আমাদের গুরুদেবের আদেশে উষা নিত্য সে মূর্ত্তি অর্চ্চনা করিতে যাইত। অবশ্য সে যখন শিবপূজা করিতে যাইত, তখন তাহার সঙ্গে বাড়ীর দাসী গমন করিত।

উষার হাতে পূজোপকরণপূর্ণ আধার। সে যখন আসিতেছিল, আমি উন্মুক্ত জানালাপথে তাহা দেখিতে পাইতেছিলাম। সে শিবমন্দিরে না গিয়া আমার নিকট কেন আসিতেছে, বুঝিতে পারিলাম না। বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু ব্যাপার জানিবার জন্য একটু উৎসুক হইয়াছিলাম, তবে সে ঔৎসুক্য লইয়া আমাকে অধিকক্ষণ কাটাইতে হয় নাই—কিয়ৎক্ষণ পরেই উষা আসিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার মুখখানা বড় ভার—বড় ম্লান। বাহিরে বর্ষাচ্ছন্ন প্রকৃতি যেমন ভার—উষার মুখও তেমনি ভার।

আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "কি গো, মুখ অত ভার কেন?"

উষা গলা ঝাড়িয়া কথা কহিল। গলা কিন্তু তথাপি ভার। বলিল, "আজ তোমার শরীর কেমন?"

আমি। ভাল নয় উষা! জীবন-প্রদীপ নিবিয়া আসিতেছে।

উষা। কেন আবার এমন হইল? বেশ উপকার হইয়াছিল—চলিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতে পারিতেছিলে, নিরক্ত শরীরে একটু রক্তের ভাব দেখা দিয়াছিল, আবার কেন এমন হইল! বাবা বাণেশ্বরদেবের মনে কি আছে জানি না।

আমি। তাঁহার মনে আছে, সংহারশূল দ্বারা আমার বক্ষছিন্ন করা। যাক্, আ'জ আবার তোমার মুখ এত ম্লান কেন?

উষার চক্ষুকোণে জল আসিল। নতমুখে কাতর-করুণ স্বরে বলিল, "যে হতভাগীর স্বামী রোগ-শয্যায়, তার মুখ ম্লান হইবে না ত কার মুখ ম্লান হইবে।"

আমি। তুমি বোধ হয়, শিবমন্দিরে যাইতেছিলে?

উষা। হুঁ।

আমি। সেখানে না গিয়া আমার কাছে আসিলে কেন?

উষা। তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার আছে।

আমি। পূজা সমাপ্ত করিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই হইত।

উষা। তাই যাইতেছিলাম—কিন্তু প্রাণের মধ্যে অত্যন্ত উপসর্গ বোধ হইতে লাগিল। এমন ভাব লইয়া পূজা করিতে গেলে পূজায় কি মনঃসংযোগ করা যায়?

আমি। এমন কি কথা?

উষা। বলি শোন। আমি তোমার স্ত্রী—দাসী ব্যতীত আর

কিছুই নই। যাহা তোমরা পিতাপুত্রে পরামর্শ করিয়া সম্পাদন করিতেছ, তাহার উপরে কথা বলা আমার নিতান্ত অন্যায়। তা জানি, কিন্তু প্রাণের বড় আকুলতা জন্মিয়াছে—তাই আসিয়াছি। আমায় ক্ষমা করিয়ো——

আমি। কথাটা কি তাই আগে বল না।

ঊষা। বাবা নাকি দিদির (সন্ধ্যার) বিষয় বিক্রয় করিতে গেলেন ?

আমি। হাঁ—সে কথা কেন ?

ঊষা। তুমি সে বিষয়ের মালিক বলিয়া বিক্রয় করিবে ?

আমি। হাঁ।

ঊষা। সন্ধ্যা তোমাকে দান করিয়াছে বলিয়া তুমি তাহার মালিক হইয়াছ ?

আমি। হাঁ।

ঊষা। সে তোমাকে কেন দান করিল ?

আমি। ভালবাসিত বলিয়া।

ঊষা। এখন বাসে না ?

আমি। না।

ঊষা। তবে এখন তাহার বিষয় নেবে কেন ?

আমি। দোষ কি ?

ঊষা। দোষ আছে। পাপপথ যদি পরিত্যাগ করিয়াছ, তবে কেন সে ভাবনা আবার ভাবিবে ? আমাদের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে, আমাদের আর পাপের ভাবনা ভাবা উচিত নয় ?

আমি। সে কি ঊষা ; আমার দিনই ফুরাইয়া আসিয়াছে। তুমি বলিলে, আমাদের দিন ফুরাইয়াছে—কেন তোমার কি হইয়াছে ? তোমার ত কোন অসুখ-বিসুখ নাই !

উষার শিবার্চ্চনা করিতে গমন।

[৯৭ পৃঃ।

উষা। না আমার কোন অসুখ নাই—তা না থাক। কিন্তু তুমি আর সন্ধ্যার বিষয় লইয়া ভাবা-চিন্তা করিয়ো না। উহাতে তাহার কথা তুমি ভুলিতে পারিবে না। পাপ ভুলাই নাকি প্রায়শ্চিত্ত।

আমি। তাহার সম্পত্তি বেচিয়া ত্রিশ হাজার টাকা মিলিতেছে। বাবার অনেক কর্জ্জ—দোকানখানি উঠিয়া যাইতেছে। এ অবস্থায় ত্রিশ হাজার টাকা পাইলে তিনি গুছাইয়া লইতে পারেন। এতগুলি পরিবার লইয়া নতুবা তাঁহার কি উপায় হইবে? আমি পুত্র হইয়া এক-দিনও তাঁহার সাহায্য করি নাই।

উষা। পাপমুগ্ধা এক স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিয়া পিতার সাহায্য করা তেমন মনুষ্যত্বের কাজ নহে।

আমি। সন্ধ্যা অসতী —

উষা। সে ত অনেকদিনই জানা গিয়াছে।

আমি। তার বাড়ীর সরকারকে নাকি রূপ বিক্রয় করিয়াছে।

উষা। যে হতভাগী স্বামীহত্যায় অনুমোদন করিয়াছে, সে কোন্ কাজ করিতে না পারে?

আমি। আমি তাহার সর্ব্বনাশ করিব—

উষা। কেন, তুমি তাহার সর্ব্বনাশ করিবে কেন? সে পাপ করিয়াছে, সে পাপ করিতেই থাকিবে, তাতে তোমার কি?

আমি। জানি না, কিন্তু তাহার অনিষ্ট না করিলে যেন আমার প্রাণে শান্তি আসিবে না। এই সম্পত্তি বিক্রয়ে এক নড়ীতে দুই সাপ মরিবে। আমাদের যথেষ্ট টাকা আসিবে—ঋণ পরিশোধ হইবে—দোকানের কাজ চলিবে, সংসারের অভাব ঘুচিবে। অপরপক্ষে সয়তানী সন্ধ্যা সমুচিত শাস্তি পাইবে।

উষা। কি শাস্তি পাইবে?

আমি। কপর্দ্দকশূন্য হইবে। ভিক্ষা করিয়া উদরপূর্ণ করিতে হইবে।

উষা। সে যে মহাপাতক করিয়াছে, তাহাতে তাহার ইহলোকে বিবিধ লাঞ্ছনা ও পরকালে অনন্ত নরক ব্যবস্থা। কিন্তু তুমি আবার তাহার কাজের সংশ্রবে কেন যাইতেছ ?

আমি। তোমার ভয় কি ?

উষা। আমার বড় ভয় করে।

আমি। কিসের ভয় ?

উষা। বলিতে কষ্ট হয়——

আমি। বল না, শুনিয়া যদি ভাল বুঝি, কর্ত্তব্য বুঝি, নয় না বিক্রয় করিব।

উষা। সে কথা বলিতে কণ্ঠ শুকাইয়া আসে।

আমি। তথাপি বল।

উষা। সেদিন গুরুদেব বলিয়াছিলেন, মানুষ মৃত্যুকালে যদি কোন কৃতপাতক মানুষের চিন্তাধীন হইয়া যায়, তবে সেই কৃতপাতকীর পাতকের অধীন হইয়া নরকভোগ করে।

আমি। মিছে কথা। যাক্—এখন তুমি পূজা করিয়া আইস। ক্ষুধা হইয়াছে—পূজা সারিয়া আসিয়া ভাত আন।

উষা আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু আমার ক্ষুধা হইয়াছে শুনিয়া আর কিছু না বলিয়া অধিকতর বিষণ্নমুখে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

উষা যখন যায়, তখন আমি উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, চিন্তাভারক্লিষ্টা মৃদুমন্থরগামিনী সৌন্দর্য্য-প্রতিমা উষা একখানা পূজোপকরণাধার হাতে করিয়া চলিয়াছে। সে যে কি স্থির-ম্লান অথচ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, তাহা বলিতে পারি না। গোড়ায় যদি এ সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইতাম, তবে বুঝি এমন করিয়া

পাপ-জীবনের অবসান হইত না। হায়, একদিনের তরেও উষাকে এক বিন্দু সুখী করি নাই। একদিনের জন্যও তাহাকে একটা মিষ্ট কথায় তুষ্ট করি নাই।

উষা দৃষ্টির অন্তরালে গেল। আমার মনে হইল, উষা বলিতেছিল, "আমাদের মরণের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে।" কেন, সে মরিবে কেন? একথা বলিবার উদ্দেশ্য কি? আমি মরিলে তবে কি সে আত্ম-হত্যা করিবে? ইহজীবনে একদিনও তাহাকে সুখী করিতে পারি নাই,—আবার আমার জন্য আত্মহত্যা করিয়া পরজীবনে নরক-যন্ত্রণা সহ্য করিবে! শুনিয়াছি, আত্মঘাতীর অনন্ত নরক!

সেইদিন তিনটার সময় এটর্ণি, উকীল ও রেজিষ্টার প্রভৃতি আমা-দের বাড়ী আগমন করিলেন এবং ত্রিশ হাজার টাকার বিনিময়ে দলিল রেজিষ্টারী করিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার পরে উষার সহিত সাক্ষাতে পুনরায় অনেক কথা হইয়া-ছিল, কিন্তু ঐ বিষয় লইয়া আর কোন কথাই হয় নাই। যে কার্য্য সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে, তাহা লইয়া আলোচনা করাই বৃথা।

তবে ঐ ত্রিশ হাজার টাকা একত্রে প্রাপ্ত হইয়া আমাদের দরিদ্র পরিবারের মধ্যে যেমন একটা আনন্দপ্রবাহ উত্থিত হওয়া উচিত ছিল, তেমন কিছুই হয় নাই। বাবা উষাকে দশ হাজার টাকা গণিয়া দিয়া-ছিলেন, উষা তাহা গ্রহণ করে নাই; সে বলিয়াছিল, আমি এক কপ-র্দ্দকও লইব না। টাকায় আমার কোন প্রয়োজন নাই। আমি আপনার পুত্রবধূ—যতদিন বাঁচিব, এক মুঠা অন্ন দিবেন! মাকেও কিছু দিতে গিয়াছিলেন, মাও গ্রহণ করেন নাই। মা বলিয়াছিলেন, "পুত্রের চাকুরী করা টাকা হইলে আনন্দে বাক্সে তুলিতাম। সেই-ই আমার যাত্রা করিয়া বসিয়া আছে, টাকায় আমার কি হইবে!"

উনবিংশ উল্লাস।

বিমুক্তি।

অগ্রহায়ণ মাস ;—হিমানী-কর-সম্পাতে দিক্‌বধূ অলসিত। কফ কাসি জ্বর মানবে মানবে প্রতিষ্ঠিত।

আমার অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। এখন যাই, তখন যাই! আত্মীয়-স্বজন প্রতি মুহূর্ত্তে আমার বিয়োগ-কল্পনায় মুহ্যমান। উষা ক্ষীণ হইয়া উঠিয়াছে।

সেই সময় একদিন শুনিতে পাইলাম, সন্ধ্যার সমস্ত সম্পত্তি হইতে সে বঞ্চিত হইয়াছে। আমি যাহার নিকট বিক্রয় করিয়াছিলাম, সে সমস্ত দখল লইয়া সন্ধ্যাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। সন্ধ্যা পথের ভিখারিণী হইয়া দিনকতক এদিক-ওদিক করিয়া অবশেষে এক বেশ্যাপল্লীতে আশ্রয় লইয়াছে, শ্যাম-মধুকর শূন্যপাত্র দেখিয়া আপন আলয়ে ফিরিয়া পড়িয়াছে।

সন্ধ্যার অবস্থা শুনিয়া মনে বড় কষ্ট হইল! কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, পাপ-কার্য্যের পুরস্কারই এইরূপ। যদি সে শ্যাম বিশ্বাসকে আত্ম-দান না করিত—কুকুরকে ঠাকুরের আসনে না বসাইত, আমি কখনই তাহার বিষয় বিক্রয় করিতাম না। কিন্তু পরক্ষণেই হাসি আসিল—হায়! যে স্বামী-দেবতার ছিন্নমুণ্ড উপপতির পদতলে ডালি দিতে পারে, সে আর একটা পুরুষকে রূপোপহার দিতে পারে না!

আমার উঠিবার সামর্থ্য ছিল না—পার্শ্ব পরিবর্ত্তনেরও ক্ষমতা ছিল

না। বিছানার উপরে মৃত মানবের কঙ্কালবৎ পড়িয়া থাকিতাম—ভয়ে বালক-বালিকা কাছে আসিত না। আত্মীয়-স্বজনও বড় নিকটে ঘেঁসিত না। এক মা—আর উষা। ইহারাই সর্ব্বদা নিকটবর্ত্তী থাকিয়া সুশ্রূষা করিত।

তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছিল। সন্ধ্যার কথা ভাবিতেছিলাম, আর সন্ধ্যা যে ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহাও বেশ অনুভব করিতে পারিতেছিলাম। সহসা কি হইল, সব গোলমাল হইয়া পড়িল! কোথায় রহিয়াছি—কি করিতেছি—আমার কি অবস্থা—সব যেন গুলিয়ে গেল। আমার যেন আর কোন অসুখ নাই, আমি যেন কোন বিষয়ে বাধ্য নহি। তখনকার অবস্থা আমি ঠিক করিয়া তোমাদিগকে বলিতে পারিতেছি না। কোন বিষয় চিন্তা করিতে করিতে যেমন নিদ্রাগত হইবার সময়কার অবস্থা—অথচ চিন্তনীয় বিষয়ও মনে আছে, —ঘোলা ঘোলা মনে আছে—ক্ষীণভাবে মনে আছে—অথচ যেন একটা সুখের অবস্থা—আরামের অবস্থা আসিতেছে—তখন আমার সেইরূপ বা তাহা হইতে আরও একটু উন্নত অবস্থা উপস্থিত হইল।

ইহার কিয়ৎক্ষণ পরে আমার বোধ হইতে লাগিল, আমার মাথার উপরে একটা গোলাকার ছটা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দেবতার মাথায় ছটা দেখিয়াছ? ইহার আকার কতকটা সেই প্রকার; কিন্তু উজ্জ্বল—সুমনোহর। ইহাকে সুন্দর বর্ণবিশিষ্ট মেঘ বলা অপেক্ষা সমুজ্জ্বল আলোক বলিলে ঠিক হয়। কথা দ্বারায় ইহার বর্ণনা হয় না।

তখন আমার সেই ছটার উপরে দৃষ্টি পতিত হইল। আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম, সে দৃষ্টি আমার অন্তর্দৃষ্টি।

অন্তর্দৃষ্টিতে আমি দেখিতে লাগিলাম, ঐ ছটা ক্রমে বৃহদাকার ধারণ করিল। তরল—উজ্জ্বল—বাষ্পাধার—সেই চিত্রছটার মধ্যে যেন

বায়স্কোপ প্রদর্শিত হইতেছিল। আমার জীবনের সমুদয় ঘটনাবলী ছবির আকারে সেই গুপ্তচিত্রমধ্যে দেখিতে লাগিলাম। একে একে ধীরে ধীরে—অথচ একের পর আর—অতি সন্তর্পণে আসিতেও চলিয়া যাইতে লাগিল। প্রথমকার দৃশ্য—বেশ আনন্দময়। তারপরে কত ঘটনা ছবি আসিল ও চলিয়া গেল। সব গেল—শেষে সন্ধ্যা আসিল। সন্ধ্যা বড় ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে আমাকে অভিসম্পাত করিতে করিতে চলিয়া গেল। এবার আসিল কার্ত্তিকঠাকুরদা—কার্ত্তিকঠাকুরদার ভীষণ-অনল মূর্ত্তি—তাহার ক্রোড়দেশে হাস্যময়ী ঊষা। আমার শিরায় শিরায় আগুন জ্বলিল—ধমনীতে ধমনীতে প্রলয়ের বিষাণ বাজিল—আর সহ্য করিতে পারিলাম না। ঝাঁপ দিয়া উঠিলাম, তাহাদিগকে ধরিয়া শাস্তি দিতে গেলাম—আর অমনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। এই সময় আবার সন্ধ্যা আসিল এবং তাহার পাতক-প্রসুপ্ত নিশীথ-মদির-ভরা চক্ষুর্দ্বয় একবার অলসে-লালসে আমার চক্ষুর উপরে ফেলিল। কেন বলিতে পারি না, আমার মনে হইতে লাগিল, যেন কোন অতল শূন্য প্রলয়-গহ্বরের তীরে তীরে আমি ঘুমন্ত চলিয়া বেড়াইতেছি—সে গহ্বর যেন তাহার সমস্ত অস্তিত্বকে গ্রাস করিবার জন্য আমাকে তাহার শূন্য উদরের মধ্যে প্রাণপণে টানিতেছে—আমি যেন প্রাণপণে সে আকর্ষণ নিবারণ করিতে পারিতেছি না!

হঠাৎ বাহিরের ক্রন্দন-রোল আমার কর্ণে গেল! বাহবা, বাঃ! আমি মরিয়াছি!

আমার আত্মীয়-স্বজন আমার পরিত্যক্ত স্থূল দেহটাকে লইয়া তাহার কর্ণমূলে 'তারকব্রহ্ম' নাম শুনাইতেছে। আমার মা, আমার ভগিনী, আমার কাকীমা, জ্যেঠাইমা সকলেই হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া বাড়ীখানাকে বিদীর্ণ করিতেছেন। বালক-বালিকাগণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া

শোকাশ্রুপাত করিতেছে। হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া বাবা কাঁদিতে-ছেন। আর হতভাগিনী উষা—কাঁদিয়া, মাথা কুটিয়া রক্ত বাহির করিয়া ফেলিয়াছে।

কেহ খাটিয়া আনিতেছে, কেহ শ্মশান-সজ্জা করিয়া লইতেছে, কেহ কেহ ক্রন্দমান আত্মীয়-স্বজনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা পাইতে-ছেন।

আমি অনেকক্ষণ তাহাদের নিকট দাঁড়াইয়াছিলাম। আমি তাহা-দিগকে বেশ দেখিতেছিলাম—তাহাদিগের কথা ও কান্না শুনিতে-ছিলাম, কিন্তু তাহারা আমায় দেখিতে পাইল না। উষার নিকটে গিয়া কয়েকটি কথাও বলিলাম, কিন্তু হায়! সে শুনিতে পাইল না।

আরও কিয়ৎক্ষণ পরে শবদেহ বাহিরে লইয়া গেল। আত্মীয়-স্বজনগণও কাঁদিতে কাঁদিতে চারিদিকে ছিটাইয়া পড়িল। উষাকে কে ধরিয়া স্নান করাইতে লইয়া গেল।

আমি চলিলাম, নিঃসঙ্গ—নিরাশ্রয়—অনন্ত ধূ ধূ অপরিজ্ঞাত স্থান! কোথায় যাইব!

কিন্তু তখনও আমি যেমন ছিলাম, ঠিক তেমনই আছি। চিন্তা, কামনা, বাসনা, জ্ঞান, আকাঙ্ক্ষা—সব ঠিক আছে; নাই কেবল স্থূল দেহটা।

আমাকে তোমরা বিদায় দাও! আমি তোমাদের স্থূল বায়ুতে আর জীবন ধারণ করিতে পারিতেছি না। সেই সন্ধ্যার একটু পরে চক্রে আসিয়াছি—কিছুতেই আর থাকিতে পারিতেছি না। আরও যদি রাখ, অভিসম্পাত করিব।

ওঃ! তাই,—তা' আজ আর বলিবার শক্তি আমার নাই। পনর দিন পরে আর একদিন চক্র করিয়া আমাকে ডাকিয়ো—সেদিন

আসিয়া মৃত্যুর পর হইতে আর এ পর্য্যন্ত প্রেতলোক সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছি, বলিব।

হাঁ, আমি এখন নরকে—নরকোৎসবে নিমগ্ন আছি। বিদায়! নমস্কার !!

দ্বিতীয় চক্র
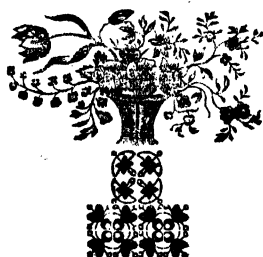
প্রথম উল্লাস।

পরলোকে।

তোমাদের আহ্বানে, তোমাদের চক্রে আজি আবার আসিয়াছি। সে দিবস কি শুনিতে চাহিতেছিলে, বেশ গুছাইয়া প্রশ্ন কর—আমি যত দূর জানি, বলিয়া যাইব। ইহা আমার জীবনের ঘটনা নহে যে, এক দিক হইতে বলিয়া যাইব, আর তোমরা শুনিয়া যাইবে!

যাঁহারা চক্র করিয়াছিলেন, তন্মধ্য হইতে চক্রেশ্বর বলিলেন, "আপনার প্রেত-জীবনে প্রেতলোকে যাহা যাহা দর্শন করিয়াছেন, সেই সমুদয় আমাদিগকে বলুন, আমরা শ্রবণ করি। হয় ত সে লোকের অনেক বিষয়ের তথ্যই আমরা জানি না, প্রশ্ন করিব কি প্রকারে? কলিকাতায় যাদুঘর আছে, যে ব্যক্তি তাহা অবগত নহে, সে কলিকাতাবাসী লোক পাইলে তাহাকে কি প্রকারে জিজ্ঞাসা করিবে, যাদুঘরে কি কি পদার্থ আছে? বর্ত্তমানে আমরা স্থূলজগতের লোক—সূক্ষ্মজগতের সংবাদ রাখিব কি প্রকারে? অতএব আপনি দয়া করিয়া সেখানকার সমস্ত সংবাদ বলুন।"

মোহাবিষ্ট-কণ্ঠে প্রেত উত্তর করিল, "অসম্ভব! কলিকাতায় থাকিয়াও যেমন ইহার সমস্ত পথ-উপপথগুলির সংবাদ রাখা যায় না, কোন্ সময় কোথায় কি ঘটিতেছে, তাহা অবগত হওয়া যায় না, তদ্রূপ প্রেতলোকে থাকিয়াও প্রেতলোকের সমস্ত স্তরের সংবাদ বলা যায় না।"

প্রশ্ন। প্রেতলোকে কি স্তরভেদ আছে?

উত্তর। হাঁ। সকলে সকল স্তরে যাইতেও সক্ষম নহে। মর্ত্ত্য-লোকে যে যেমন কার্য্য করিয়াছে, প্রেতলোকে সে তেমনই স্তরে প্রবেশাধিকার পাইয়াছে। মর্ত্ত্যলোকে যে, যে প্রকার জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছে, প্রেতলোকে সে তদ্রূপ স্থানে জ্ঞানের বিকাশ লইয়া আছে। খুব একটা ছোট উদাহরণ দেই—কিন্তু উদাহরণটা ছোট হইলেও প্রমাণে ছিদ্র নাই। তোমার টাকা আছে, তুমি কলিকাতায় আসিলে বা কোন বিদেশে গমন করিলে, ধনিগণ আসিয়া তোমার বন্ধুশ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া পড়িলেন। আর তুমি যদি বিদ্বান হও—বিদেশে বিদ্বানগণ তোমার বন্ধু হইবেন। গায়ক হও, গায়কসম্প্রদায় আসিয়া তোমার সহিত মিশিবেন। এইরূপ জ্ঞানী হও, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের সঙ্গ পাইবে। দস্যু-তস্কর হও, তাহাই মিলিবে। ফল যে যেমন, তেমনই সঙ্গ মিলিবে। পরলোকেও তদ্রূপ। আবার অধিকারও সকলের সমান নহে, যে যতদূর জ্ঞানোন্নতি বা আত্মোন্নতি করিয়া আসিয়াছে, সে এখানে ততদূর মুক্ত ও স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রশ্ন। ভাল, আমরা ইচ্ছা করিয়া যাহাকে তাহাকে চক্রে আনিতে পারি না কেন?

উত্তর। সকলের আসিবার ক্ষমতা থাকে না। ইচ্ছা করিয়াও অনেকে আসেন না, তাঁহাদিগের শক্তি অধিক; উচ্চ স্তরে আছেন, তোমাদের শক্তি হয় ত তাঁহাদিগকে টানিতে পারে না। আবার এমন ব্যক্তি আছে, যে তোমার আহ্বান অবহেলা করিল, কিন্তু হয় ত অপর একজনের আকর্ষণ অসহ্য জ্ঞানে ছুটিয়া আসিতে বাধ্য হয়। ফল কথা, এ সম্বন্ধে মর্ত্ত্যলোকে ও প্রেতলোকে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখি না। জ্ঞান-অজ্ঞান, ভাল-মন্দ, উত্তম-মধ্যম ও অধম অধিকারী—ইহাই সর্ব্বত্র।

প্রশ্ন। প্রেতলোকে যে ঐরূপ হয়, তাহার কারণ কি ?

উত্তর। মর্ত্ত্যলোকের কর্ম্ম। এখানে যে যেমন কার্য্য করিয়া যাইবে, সেখানে গিয়া সে তেমনই অধিকারী বা ফলভোগী হইবে। তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে যে, মানুষ মরণের আগে যেমন ছিল, মরণের পরেও ঠিক তেমনই থাকে ;—একই প্রকার জ্ঞান, একই প্রকার বুদ্ধি, একই প্রকার গুণ এবং একই প্রকার ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে। মর্ত্ত্যলোকে বাসকালে যে প্রকার চিন্তা, বাসনা, আসক্তি, ভালবাসা, প্রেম প্রভৃতি ছিল, প্রেতলোকে গিয়াও তাহাই বজায় থাকে। ফল কথা, মর্ত্ত্যভূমিতে মানুষ যেন চিন্তা, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তির সাধনা দ্বারা একটি শয্যা রচনা করিয়া যান, এবং সেই শয্যায় পরলোকে গিয়া শয়ন করেন।

দ্বিতীয় উল্লাস।

চিত্রগুপ্ত।

রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর—নীরব নিস্তব্ধ। বায়ু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, প্রকৃতি জ্যোৎস্নায় স্নান করিতেছিল;—পৃথিবী অপ্সররাজ্যের মত মোহে—স্বপ্নে ভাসিতেছিল; আর সাগরগ্রামের মুখুয্যেবাড়ীর এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তিনটি যুবক প্রেতলোকের সংবাদ জানিবার জন্য চক্র করিয়া বসিয়া বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিতেছিলেন।

চক্রেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আপনার মৃত্যুকালের কথা পর্য্যন্ত সেদিন বলিয়া গিয়াছিলেন, এবং আশা দিয়া গিয়াছিলেন, পনর দিন পরে আসিয়া অপর সমস্ত কথা বলিবেন, তাই আপনাকে আ'জ আবার কষ্ট দিয়া আনিয়াছি;—অতএব দয়া করিয়া বলুন।"

কিছু ক্ষুণ্ণস্বরে প্রেত উত্তর করিলেন, "হাঁ, বলিব বলিয়াছিলাম। কিন্তু সকল কথা বলিবার সময় মনে হয় না—বড় কষ্টে আছি। আমার জীবনও বড় সুখের নহে। পার্থিব জীবনে যে মহাপাতক করিয়া আসিয়াছি, এখনও তাহার ফলভোগ করিতেছি। যন্ত্রণা অসীম—পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মর্ম্ম-ত্বকে নরকাগ্নি জ্বলিতেছে। বল, কি শুনিতে চাহ?"

চক্রে। মৃত্যুর পরে কোথায় গেলেন, কি অবস্থা ঘটিল, এখনই বা কোথায় কি অবস্থায় আছেন—সবিস্তারে বলুন।

প্রেত। বোধ হয়, তোমাদের মনে আছে; আমি সেদিন বলিয়াছি, স্থূলদেহ হইতে বাহির হইয়া কিয়ৎক্ষণ ক্রন্দনরত আত্মীয়গণের

মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিলাম, তাহারা যখন কেহই আমার কথা শুনিতে পাইল না, আমাকে দেখিতে পাইল না, এবং আমারই জন্যে কাঁদিয়া কাটিয়া চারিদিকে চলিয়া গেল—আমার পুরাতন জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পরিত্যক্ত দেহটাকেও শ্মশানে লইয়া গেল, তখন আমি আর সেখানে থাকিয়া কি করিব ভাবিয়া বাহির হইলাম।

এই স্থানে একটা কথা বলিয়া রাখি, আমার মৃত্যু হইয়াছিল, ঘরের মধ্যে—মৃতদেহও ঘরের মধ্যে ছিল। ইহা কিন্তু ভাল নহে। কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে প্রেতলোকবাসী আত্মিকগণ তাহাকে লইতে আসেন। সমজ্ঞানী বা সমশক্তিসম্পন্ন হইলে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান—কিন্তু ঘরের মধ্যে মৃত্যু ঘটিলে তাহা সহজে হয় না। স্থূলদেহ ও আত্মীয়-স্বজনের মায়া কাটাইয়া এবং কোন্ অজানা অপরিচিত দেশে যাইতে হইবে, এই কষ্ট লইয়া যতক্ষণ ঐ আত্মিক বাহিরে না আসে, ততক্ষণ সঙ্গী যুটিতে পারে না। অপরিচিত বিদেশগামী ব্যক্তি সঙ্গী যুটিলে যেমন কতকটা আশ্বস্ত হইতে পারে, প্রেতলোকগমনশীল আত্মিকও তদ্রূপ সঙ্গী পাইলে আশ্বস্ত হইয়া থাকে। অতএব প্রাচীন হিন্দুগণ মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে যেমন অনাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণে মানুষকে বাহির করিয়া তারকব্রহ্ম নাম শুনাইতেন, সেই প্রথা বজায় রাখা খুব ভাল।

তবে সকলেরই যে সঙ্গী যুটে, তাও না। স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া কোন আত্মিককে পরলোকের পথে যাত্রা করিতে দেখিলেই, অপর আত্মিকগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। তারপরে জ্ঞানী হইলে জ্ঞানবান আত্মিককুল, দাতা হইলে দাতাগণ, কর্ম্মী হইলে কর্ম্মীদলে—এইরূপে সঙ্গে করিয়া আপন আপন স্তরে লইয়া যান। কিন্তু যে একেবারে পাপী—আমার মত যাহাদের অবিশুদ্ধ কামময় শরীর, তাহারা তাঁহাদের কথা বুঝিতে পারে না—সঙ্গ ভালবাসে না—ঊর্দ্ধে

উঠিবার শক্তিও পায় না—কাজেই একা পড়িয়া থাকে, আর বৈতরণীর কূলে কূলে প্রেতজীবনে কাঁদিয়া ফিরে।

চক্রে। অপেক্ষা করুন। কয়টি কথা জানিবার আছে।

প্রেত। কি জানিতে চাহ, বল ?

চক্রে। আপনি বলিলেন, পরলোকের পথে নূতন যাত্রী দেখিলে আত্মিকগণ তাহার নিকটে আগমন করেন, এবং তিনি যে শ্রেণীর, সেই শ্রেণীর আত্মিকগণ তাহাকে সঙ্গে লইয়া গমন করিয়া থাকেন। অপর যাহারা কাম-কলুষিত, তাহারা পড়িয়া থাকে। কিন্তু যে সকল আত্মিক আসেন, তাঁহারা কি প্রকারে জানিতে পারেন যে, এই নূতন যাত্রী কোন্ শ্রেণীর লোক।

প্রেত। তোমরা চিত্রগুপ্তের গল্প শুনিয়াছ ?

চক্রে। যমের দেওয়ান ?

প্রেত। হাঁ।

চক্রে। শুনিয়াছি ;—কিন্তু বোধ হয়, উহা পৌরাণিকের রূপক। সত্যই কি আর যমরাজা কাছারি করিয়া বসেন, সত্যই কি আর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জীবকুলের ভালমন্দ—পাপ-পুণ্যের খুটি-নাটির খবর লিখিবার জন্য রাত্রি দিবা চিত্রগুপ্ত খাতা খুলিয়া বসিয়া থাকেন ? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র জীবের কর্ম্মাকর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম লিপিবদ্ধ করা কল্পনার অতীত—ধারণার বহির্ভূত।

প্রেত। হাঁ, উহা রূপকই বটে, কিন্তু অসত্য নহে। এই চিত্রগুপ্তেই সমস্ত লেখা থাকে। ইহা দেখিয়াই পরলোকের প্রথম সঙ্গিগণ সাহায্য করিয়া থাকেন।

তোমরা বোধ হয় অবগত আছ, মানুষ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, লোকটা সৎ কি অসৎ, বুদ্ধিমান কি বোকা, বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী ;

ইত্যাদি। কি করিয়া বুঝিতে পারা যায়, জান? শরীরের জ্যোতি দেখিয়া। এই জ্যোতি হয়, মানুষের মনের ভাব লইয়া। সদসৎ চিন্তা—সদসৎ কর্ম্ম—সদসৎ শক্তি মনের সঙ্গে ঘুরিয়া ফিরিয়া মনের উপর দাগ মারিয়া বসে। ইহাকে সংস্কার বলে। সংস্কার জ্যোতি গঠন করে;—এই জ্যোতি বহু বর্ণে শোভিত। এই জ্যোতি জীবাত্মার সহিত জড়িত হইয়া থাকে। আমরা যখন ভূমিষ্ঠ হই, তখন হইতে আর যখন পরলোকের পথে যাত্রা করি, তখন পর্য্যন্ত যে সমস্ত কার্য্য করি, চিন্তা করি, কল্পনা করি, সে সমস্তই মনের উপর পড়িয়া সংস্কার হয়—সংস্কারই জ্যোতিরূপে জীবাত্মার গলা জড়াইয়া বসিয়া থাকে। মনের ক্ষয় না হইলে এই জ্যোতির ক্ষয় হয় না। তবে স্বর্গ-নরক ভোগাদি দ্বারা এই জ্যোতির হ্রাস হয় এবং ক্ষয়িত-সংস্কার মানব তখন আবার জন্মগ্রহণ করিতে ধাবিত হয়। এই জ্যোতি বহু বর্ণে চিত্রিত এবং গুপ্ত—পৌরাণিকের কথায় ইহাই চিত্রগুপ্ত। এতদন্বিত পরিচয় লইয়াই মানবের প্রথম যাত্রার শুভাশুভ স্থান নির্ণীত হয়।

চক্রে। এই গুপ্ত বর্ণ-বৈচিত্র্যে কি করিয়া ভালমন্দ সদসৎ জানিতে পারা যায়?

প্রেত। এ সকল প্রশ্নের উত্তর তোমাদের মর্ত্ত্যের মানবের নিকটেও পাইতে পার। এক কথা গোড়ায় বলিয়া দিয়াছি, ইহকাল পরকাল—ভূর্ভুবস্বঃ—এক সূত্রে—এক নিয়ম-শৃঙ্খলায় আবদ্ধ। কোথাও 'আজগুবি' বা অদ্ভুত কিছুই নাই। এখানে যাহা স্থূল, পরলোকে তাহা সূক্ষ্ম—এইমাত্র প্রভেদ। এখানকার কর্ম্ম, সেখানকার জ্ঞান। ঐ বর্ণ-জ্যোতি সম্বন্ধে আমি যত দূর অবগত আছি, তাহা বলিতেছি শোন——

১। গভীর মেঘের বর্ণ জ্যোতি হইলে, সেই মানব হিংসুক ও দ্বেষী।

২। কালো জমির উপরে রক্তবিদ্যুতের ছটা থাকিলে ক্রোধের চিহ্ন।

৩। বহ্নিশিখার ন্যায় জ্যোতি হইলে রিপুদাস হয়।

৪। পুরাতন লৌহবৎ জ্যোতিবর্ণ হইলে লোভী।

৫। কপিশ বর্ণ হইলে স্বার্থপর।

৬। শ্বেতাভাযুক্ত সবুজ বর্ণের মধ্যে অল্প লাল জ্যোতি থাকিলে হিংসুক।

৭। শ্বেতাভাযুক্ত সবুজ বর্ণ জ্যোতি প্রবঞ্চনার চিহ্ন।

৮। গোলাপপুষ্পের ন্যায় বর্ণ হইলে ভালবাসার চিহ্ন। আর লাক্ষার ন্যায় বর্ণ হইলে সমগ্র মানবজাতির উপরে ভালবাসার চিহ্ন।

৯। হরিদ্রা বর্ণ বুদ্ধিবানের পরিচায়ক।

১০। গাঢ় অথচ পরিচ্ছন্ন নীলবর্ণ ধার্ম্মিকের চিহ্ন।

১১। ঈষৎ নীলবর্ণ ভক্তিভাবদ্যোতক।

১২। রক্তের সহিত হরিদ্রা বর্ণ দাতৃ-শক্তির পরিচায়ক।

১৩। পিঙ্গল বর্ণ ক্রূর ও বিশ্বাসঘাতকতার চিহ্ন।

১৪। রামধনুর বর্ণ অসৎকার্য্যে রত হওয়ার নিদর্শন।

এইরূপ আরও অনেক প্রকার চিহ্ন আছে। আমি সমস্ত অবগত নহি। এই সকল বর্ণ-জ্যোতি দেখিয়াই সমভাবাপন্ন আত্মিকসঙ্গিগণ নবীন যাত্রীকে ডাকিয়া তাঁহাদের নিজের স্তরে লইয়া যান।

তৃতীয় উল্লাস।

স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ।

চক্রেশ্বর বলিলেন, "আপনি ঐরূপ সঙ্গীর সঙ্গ পান নাই, বলিতেছিলেন। কেন, আপনি কি কোন স্তরে যাইবারই অধিকারী নহেন?"

প্রেত। না। কিন্তু কথাটা বুঝিবার জন্য তোমাদিগকে একটু পিছাইয়া পড়িতে হইবে।

চক্রে। আপত্তি নাই, বলুন।

প্রেত। মানুষের তিন প্রকার দেহ, ইহা বোধ হয় তোমরা অবগত আছ?

চক্রে। কিন্তু অবগত থাকিলেও আপনি পরলোকগত মানব, আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি। কেন না, তাহা হইলে নির্ভুল বলিয়াই বিবেচনা করিতে পারিব।

প্রেত। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—জীবাত্মা এই তিন প্রকার দেহে বাস করিয়া থাকেন। স্থূল শরীরে ভূর্লোক (১) বা পৃথিবীতে বাস, সূক্ষ্ম শরীরে ভুবর্লোক (২) বা পিতৃলোকে (প্রেতলোক) এবং স্বর্লোকে (৩) বা স্বর্গে বাস হয়। মহর্লোকেও (৪) সূক্ষ্ম শরীরে বাস হয়। আর কারণ শরীরে জনলোক (৫) তপলোক (৬) ও সত্যলোকে (৭) বাস হয়।

(১) Physical Plane.
(২) Astral Plane.
(৩) Lower Mental Plane.
(৪) Higher Mental Plane.
(৫) Buddhic Plane,
(৬) Nirvanic Plane,
(৭) Maha Nirvanic Plane.

এখন এই যে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই তিন প্রকার দেহের কথা বলিলাম, ইহা কি কি উপাদানে প্রস্তুত, তাহাও জানিবার আবশ্যক।

স্থূলদেহকে অন্নময়কোষ বলে। যাহা ভক্ষণ করা যায়, তাহাকেই অন্ন বলে। আহারাদির দ্বারা এই কোষ পুষ্ট ও বর্দ্ধিত—কাজেই এই দেহ (স্থূলদেহ) অন্নময়কোষ।

প্রাণময়,মনোময় এবং বিজ্ঞানময় কোষের দ্বারা সূক্ষ্ম শরীর গঠিত।

আনন্দময় কোষ, কারণ শরীর।

এই তিন প্রকার শরীর নাশ হইলে, তবে জীব ব্রহ্মাণ্ডের অতীত স্থানে গমন ও মুক্তিলাভ করেন, কিন্তু তোমরাও এ সকল কথা যেমন উচ্চ চিন্তাশীল পণ্ডিতগণের নিকট শুনিয়া থাক, আমরাও পরলোকে তাহাই শুনি। আমার এ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান কিছুই নাই। আমি ইতিপূর্ব্বে বহুদিন তোমাদের অত্যন্ত নিকটে কাটাইয়াছি; তখন যাহারা আমার সঙ্গী ছিল, তাহারা আমারই মত খুনী, দস্যু ও পারদারিক—তাহাদের নিকটে এ সকল বিষয় কিছুই জানিবার উপায় ছিল না। তোমাদের পৃথিবীতে তাহাদের সংসর্গ যেমন কষ্টকর, পরলোকে আবার তদপেক্ষা অনেক অধিক। তারপরে ভোগের দ্বারা সে অবস্থার অনেক ক্ষয় হওয়ায়, এখন ক্রমে ক্রমে তাহার পর পর তিনটি উচ্চ স্তরে গমন করিয়াছি। সেই সকল স্তরের কথা তোমাদিগকে যাহা বলিব, তাহা নিঃসন্দেহ তথ্য ; তাহার উপরের কথা যাহা বলিব, তাহা সেই সকল স্তরের আত্মিকগণের নিকটে যাহা শুনিয়াছি—তাহাই। তবে সে দেশের লোক মিথ্যা বলে না।

চক্রে। আপনি বলিলেন, প্রথমে আপনি আমাদের পৃথিবীর অতি নিকটে থাকিয়া যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, এ কথার অর্থ আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

প্রেত। মৃত্যুর পরে মানুষ সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে; কিন্তু তখন প্রাণময় কোষ। প্রাণময় কোষের অপর নাম ছায়াশরীর। এ শরীর লইয়া জীব উর্দ্ধে উঠিতে পারে না। তোমরা বোধ হয় জান, সাত প্রকার পার্থিব উপাদানে এই ভূর্লোক গঠিত। ইহার মহাব্যোমাংশে প্রাণময় কোষের উপযুক্ত বা সমগুণবিশিষ্ট বায়ু প্রভৃতি। কাজেই প্রাণময় কোষে অবস্থিত ব্যক্তি পৃথিবীর উর্দ্ধে যাইতে পারে না। এ অবস্থাটা বড় যন্ত্রণাদায়ক—শূন্য, ধূ ধূ অবলম্বন শূন্য—বায়ু-ভূত নিরাশ্রয়। কেহ কোথাও নাই—কক্ষবিচ্যুত গ্রহের ন্যায় চলিয়াছি ত চলিয়াছি। জ্ঞান আছে—অস্ফুটন্ত। মনের ক্রিয়া স্থগিত—মানসিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত জীবের সহিত এই অবস্থার তুলনা করা যাইতে পারে। মৃত্যুর পরে জীবাত্মার ইহা নির্জ্জন কারাবাস।

চক্রে। এ অবস্থা কতদিন থাকে ?

প্রেত। তাহার কিছু স্থিরতা নাই। যাহারা অসচ্চরিত্র, তাহাদের এ অবস্থা অতিক্রম করিতে অনেক সময় লাগিয়া থাকে। যাহারা সৎ, তাহারা খুব সত্বর এ অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হন।

চক্রে। আপনি এ অবস্থায় কতদিন ছিলেন ?

প্রেত। তোমাদের পৃথিবীর গণনায় এক বৎসর। এই এক বৎসর যে কি যন্ত্রণায় ছিলাম, তাহা বলিয়া জানাইবার নহে। অবলম্বন শূন্য—আশ্রয় শূন্য—অনন্ত ধূ ধূ—চলিতেছি। বিশ্রাম নাই—বাধা নাই—অনুদ্দিষ্ট পথগামী পথহারা পথিকের ন্যায় চলিতাম—কত স্তূপীকৃত প্রলয়ের অন্ধকার—কত সূচ্যভেদ্য বিরাট কুয়াসা—কত স্বর্গ-মর্ত্ত্যমোছা মেঘ-বিদ্যুৎ-বজ্রাঘাত—আমি চলিতাম। চলাই আমার কাজ ছিল—বিশ্রাম ছিল না, বিরাম ছিল না, শান্তি ছিল না, কিন্তু কেহ বলিত না চল—কেহ বলিত না বিশ্রাম করিয়ো না—কেহ বলিত না ছুটাছুটি

কর—তথাপি চলিতাম। না চলিয়া থাকিতে পারিতাম না। স্থির হই-বার উপায় ছিল না।

চক্রে। এ অবস্থা নিবারণ করিয়া দিবার ক্ষমতা কাহারও আছে কি ?

প্রেত। আছে। 'কর্ম্মভূমি এই পৃথিবী—পৃথিবী হইতে দশপিণ্ড দিলে এ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া ভোগদেহ গঠিত হইতে পারে। কিন্তু অনেক স্থলে তাহাও হয় না—আমার মত কঠোর পাপীর পাপ দূর করা মন্ত্রশক্তির কাজ নহে। তথাপি কিছু কমিয়া যায় বৈ কি!

চক্রে। ভাল, এ কথার বিশেষ অর্থ, ইহার পরে শুনিয়া লইব। তারপরে আপনার অবস্থা কি হইল, শুনিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে—আগে তাহাই বলুন।

প্রেত। ইহার পরেই পূর্ণরূপে কৃতমহাপাতকের শাস্তিভোগ আরম্ভ হইল। ঐ এক বৎসর যেন নির্জ্জন কারাবাস হইয়া গেল—তারপরে প্রকৃত দণ্ড।

চক্রে। তাহাও কি ঐ প্রাণময় সূক্ষ্ম দেহে ?

প্রেত। না। মৃত্যুর সময় যেমন অন্নময়কোষ পড়িয়া থাকে, এবং জীব প্রাণময়কোষ অবলম্বন করে; তদ্রূপ প্রাণময়কোষের কাজ সারা হইলে তাহাও সূক্ষ্ম শরীর হইতে বিচ্যুত হয়, জীব তখন মনোময়কোষে, অবস্থিতি করে। মানুষ যদি পৃথিবীতে অসৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে, তবেই সেই সকল কুকর্ম্মের সংস্কার বা পাতকরাশি দিয়া তাহার যাতনা দেহ গঠিত হয়। আর সৎলোকের ভোগদেহ গঠিত হয়। যাতনা শরীরধারী দেহী প্রেতলোকের নিম্নাংশে এবং ভোগদেহধারী ব্যক্তিগণ প্রেতলোকের উর্দ্ধাংশে গমন করিয়া থাকে। প্রেতলোক ভূর্লোকের অংশবিশেষ। উপনিষদে ভূবর্লোককে জলীয় অবস্থা বলিয়া বর্ণনা কর

হইয়াছে, অর্থাৎ জলতত্ত্ব দ্বারা ইহা গঠিত—ইহা চন্দ্রলোকের পশ্চাৎ ভাগ।

চক্রে। যাহারা পাপ-পুণ্য দুইই করিয়াছে, তাহাদের কি হয়?

প্রেত। আগে যাতনা দেহ গঠিত হয়, তারপরে ভোগে পাপের ক্ষয় হইলে,তখন ভোগদেহ প্রস্তুত হয় এবং পিতৃ-লোকে যায়। সেখানেও কামনার খেলা—সে দেহও ভোগান্তে চূর্ণ হয়, তখন বিজ্ঞানময়কোষে সূক্ষ্মদেহী স্বর্গবাসের জন্য গমন করে। আর ততদূর পুণ্য না থাকিলে, পিতৃ-লোক হইতেই জন্মগ্রহণের জন্য ফিরিয়া আসে।

চতুর্থ উল্লাস।

বৈতরণী।

যাঁহারা চক্র করিয়া বসিয়াছিলেন, তন্মধ্য হইতে একজন চক্রেশ্বরকে বলিলেন, "জিজ্ঞাসা করুন, বৈতরণী নাম্নী যে নদীর কথা শুনা যায়, তাহা কি এবং তাহার অবস্থাই বা কি প্রকার?"

ভৌতিক চক্রের নিয়ম এইরূপ যে, যে কয়জনই চক্রে বসুন, যিনি চক্রের প্রধান বা চক্রেশ্বর, তিনিই প্রেতের সহিত কথোপকথন করিবেন; অপরে প্রেতের সহিত কথা কহিতে পারিবেন না। কোন কথা জানিবার প্রয়োজন হইলে, তাঁহারা চক্রেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিবেন।

চক্রেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে।"

প্রেত। বল।

চক্রে। আমরা শুনিয়া আসিতেছি, এবং পুরাণেও আছে, মৃত্যুর পরে বৈতরণী নদীর নিকটে উপস্থিত হইতে হয়, সে বড় ভয়ঙ্করী নদী। উত্তপ্ত কটাহে যেমন জল ফুটে, তাহার জলও দিবানিশি সেইরূপ ফুটিতেছে এবং ভীষণ আবর্ত্ত। জীবকে তাহা পার হইয়া যম-সদনে উপনীত হইতে হয়। যে পুণ্যবান, সে স্বচ্ছন্দে যায়; পাপীর পক্ষে সে জল ভীষণ প্রতপ্ত। তার উপরে যমদূতগণ পার হইবার সময় 'ডাঙশ' * মারিয়া থাকে। তখন সেই তপ্ত জলে ডুবিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। হিন্দুগণ এই বৈতরণীর বড় ভয় করেন। ইহাতে সুখে

* প্রহার যন্ত্র বিশেষ।

পার হইবার জন্য তাঁহারা একটি ক্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহার নাম "বৈতরণী" করা। অবস্থাপন্ন লোকেরা জীবিতকালেই এই অনুষ্ঠান সম্পাদন করিয়া রাখেন, আর দুঃস্থেরা—তাঁহাদের পরলোকের পথে গমনশীল মৃত-আত্মীয়ের বৈতরণী পারের জন্য শ্রাদ্ধবাসরে "বৈতরণী" করেন। এতদর্থে একটি কৃষ্ণা গাভী দান করা হয়। দানের উদ্দেশ্য—

মহাঘোরে যম-দ্বারে তপ্তা বৈতরণী নদী। তাহাতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য এই কৃষ্ণবর্ণা গাভী দান করিতেছি।*

আপনি যখন সে দেশবাসী—সেখানে গিয়াছেন, তখন বলুন, বৈতরণীর ব্যাপারটা কি ?

প্রেত। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভুবর্লোক জলতত্ত্বে গঠিত। প্রাণময়কোষ পরিত্যাগ করিয়া জীব যখন মনোময়কোষে অবস্থিত হইয়া পিতৃ-লোকাভিমুখে গমনশীল, তখন জীবকে ব্যোমতত্ত্ব হইতে জলতত্ত্বে যাইতে হইবে। পিতৃ-লোকের অধিপতি যম—কাজেই যমদ্বারে জলতত্ত্ব। জীবের দেহ তখন কামনা-বাসনার সংস্কারে আবদ্ধ—অসৎ-স্বভাবাপন্ন মানবের কামনাশরীর অত্যন্ত ঘনীভূত, আর সৎভাবাপন্ন ব্যক্তির কামনাশরীর সূক্ষ্ম। যেহেতু পাপবাসনা অসৎজনের মনকে ঘিরিয়া চাপিয়া জড়াইয়া আছে। বাসনা বড় আগুন—বড় প্রতপ্ত। তাহার দ্বারা পিতৃ-লোকের বাসভূমি বা প্রথমস্তর তাহার পক্ষে আগুনের গড়—যমদূত কেহ আসিয়া তাহার মস্তকে লগুড়াঘাত করুক আর নাই করুক—সে দিবারাত্রি আপন বাসনার আগুনে আপনি পুড়িয়া দগ্ধ হইতে থাকে। এই পার্থিব-জগতে যাঁহারা ইন্দ্রিয় দমন করেন নাই—কামনা-বাসনার প্রাসাদ প্রস্তুত করিয়া সুখে নিদ্রা গিয়াছেন, ইন্দ্রিয়-

* যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদীং,
তাস্তু তর্ত্তুং দদাম্যেনাং কৃষ্ণাং বৈতরণীঞ্চ গাং।

উপভোগই যাঁহাদের জীবনের প্রধান কর্ম্ম ছিল—তাঁহাদের সেখানে সমূহ কষ্ট উপস্থিত হয়। পার্থিবজগতে যাঁহাদিগকে দাসীদাসীতে সেবা করিত, গণিকায় গীত শুনাইত, মালাকর সুবাসমালা যোগান দিত, যাঁহাদের পশুবৃত্তি উদ্বোধন জন্য পশু-পক্ষী বলি হইয়াছে—মদ্য মাংস দিয়া যাঁহাদের পাশবপ্রবৃত্তির তৃপ্তি সাধিত হইয়াছে, যাঁহারা ছলেবলে পরস্বাপহরণ করিয়াছেন—অর্থ অর্থ করিয়া দিবানিশি চিন্তা করিয়া ফিরিয়াছেন—তাঁহারা মরিলে, তাঁহাদিগকে লইয়া বৈতরণীর উত্তপ্ত জল উছলিয়া উঠে।

পরলোকে সকলেই কার্য্য হইতে মুক্ত। পরলোকে স্থূলদেহ থাকে না, সুতরাং স্থূলদেহের ভোগের উপযোগী বিষয়-আদিও থাকে না;—তা' না থাকুক, কিন্তু সে বাসনা ও আসক্তি যায় না। সুখ-শয্যায় আসক্ত ব্যক্তির শয্যায় শয়ন করিবার উপযুক্ত দেহ থাকিবে না বটে, কিন্তু শয়ন করিবার আসক্তি যায় না। গণিকাগামী ব্যক্তির ভোগের শক্তি থাকিবে না বটে, কিন্তু স্পৃহা বলবতী রহিবে। অর্থকামীর অর্থের কোন প্রয়োজন রহিবে না বটে, কিন্তু আসক্তি যাইবে না। বাসনা ও আসক্তি আরও শতগুণে বর্দ্ধিত হইবে। যিনি অর্থে আসক্ত, তিনি অর্থ খুঁজিয়া ফিরিবেন; যিনি গণিকাসক্ত, তিনি গণিকার অনুসন্ধান করিবেন; যিনি মৎস্য-মাংসাশী, তিনি তদ্দারা রসনাতৃপ্তির জন্য ফিরিবেন; যিনি দাসদাসী দ্বারা সেব্যমান, তিনি দাসদাসীর জন্য চেষ্টা করিবেন; ফলকথা, যিনি যাহাতে সমাসক্ত, তিনি তাহার জন্য সেখানে ছুটাছুটি করিবেন, কিন্তু মিলিবে না—সে সমুদয়ের সেখানে অভাব;—বিষয়-মাত্রেরই অভাব, কিন্তু অভাবজনিত অসীম যন্ত্রণা আছে। কামনা-বাসনার আগুন—সেই আগুনই ত নরকের আগুন; তাহাতে তখন জীবের প্রাণ বিদগ্ধ হইতে থাকে।

কামনা ও বাসনা, যাহা লইয়া আমরা ইহজীবনের সমস্ত কাল অতি-বাহিত করিয়া থাকি, বাস্তবিক তাহা বড়ই ভয়ঙ্কর পদার্থ এবং তাহা আমাদের স্থূল শরীরের কোন অংশ নহে, কাজেই স্থূল শরীর পরিত্যাগে তাহা পরিত্যাগ হয় না। উহা সূক্ষ্ম শরীরের বা মনের জিনিষ—মনের গায়ে লাগিয়া থাকে, এবং মনের সঙ্গেই গমন করে।

এই মনের দ্বারা যে সূক্ষ্মদেহ গঠিত হয়, তাহাতে কামনা-বাসনার আগুন জ্বলে—সে উত্তাপে ভুবর্লোকের জলীয়াংশও সেই ব্যক্তির নিকটে উত্তপ্ত হয়। সে সেখানে যাইতে পারে না, কাজেই তাহার নিম্ন স্তরে—যাতনাময় দেহ লইয়া পড়িয়া থাকে। ইহাই বৈতরণী।

দানে ত্যাগ। তাই কৃষ্ণবর্ণা গাভীদানে আসক্তির নিরাকরণ। ত্যাগেই মুক্তি, অতএব বৈতরণী নিষ্ফল কল্পনা নহে।

পঞ্চম উল্লাস।
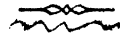
শ্রাদ্ধক্রিয়া।

চক্রেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বলিয়াছেন, এখনও আপনি আপনার কৃতাতিপাতক জন্য প্রেতলোকের ঊর্দ্ধ স্তরে যাইতে পারেন নাই। খুব সম্ভব, এখনও আপনার যাতনাশরীরই বিদ্যমান রহিয়াছে। অপরে বৈতরণী করিলেও যখন বৈতরণী পার হওয়া যায়, তখন আপনি বৈতরণী উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই কেন? আপনার কি বৈতরণী বা শ্রাদ্ধ করা হয় নাই?"

দুঃখিতস্বরে প্রেত বলিলেন, "হাঁ, যথারীতি প্রচলিতভাবে আমার শ্রাদ্ধ করা হইয়াছিল। আমি বড় আশা করিয়াছিলাম, আমার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদিত হইলে, আমার যাতনাশরীরের ভার কিছু ক্ষয় হইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই, শ্রাদ্ধ হইয়াছিল, ফল হয় নাই। আমার মত অনেক হতভাগ্য প্রেতই তাহার মর্ত্ত্যলোকস্থ আত্মীয়-স্বজনের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, শ্রাদ্ধ হইলে তাহার কিছু কষ্টের লাঘব হইবে। এমন কি প্রকৃতভাবে যদি শ্রাদ্ধ হয়, যাতনাশরীর একেবারেই দূর হইয়া যায়।"

চক্রে। তবে শ্রাদ্ধক্রিয়া দ্বারা প্রেতাত্মার উপকার হইতে পারে?

প্রেত। সবিশেষ উপকার হয়, প্রেতত্ব মোচনও হইতে পারে। প্রেত অর্থে এখানে যাতনাদেহ বুঝিয়ো।

চক্রে। তবে আপনার হইল না কেন?

প্রেত। যথারীতি শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদিত হয় নাই বলিয়া।

চক্রে। কে আপনার শ্রাদ্ধ করিয়াছিল ?

প্রেত। আমার ত সন্তান হয় নাই, উষাই আমার শ্রাদ্ধ করিয়াছিল।

চক্রে। যথারীতি সম্পাদিত হয় নাই কেন ? আপনার স্ত্রী কি ভক্তিভাবে শ্রাদ্ধ করেন নাই ?

প্রেত। না—ভক্তি অভক্তিতে কিছু আসিয়া যায় না। উষা প্রাণভরা ভক্তি দিয়া শ্রাদ্ধ করিয়াছিল, ভগবানের নিকট আমার আত্মার উন্নতির জন্য প্রার্থনাও করিয়াছিল। আমি শ্রাদ্ধদিনে তাহার নিকটে থাকিয়া সে সমুদয় দেখিয়াছিলাম, শুনিয়াছিলাম। কিন্তু পিতৃ-লোকে ভক্তিতে কিছু হয় না। ভক্তিতে দেবতার তৃপ্তি হয়, কারণ তাঁহারা ভাবগ্রাহী। পিতৃ-লোকে মন্ত্রশক্তিতে কাজ হয়। উষাকে যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধমন্ত্র পড়াইয়াছিলেন, তিনি নিজে শক্তি শূন্য ও মন্ত্রের স্বর-কম্পন বুঝেন না। কাজেই কোন কাজ হয় নাই। কেবল আমার নহে—আ'জ-কা'ল অধিকাংশ প্রেতই শ্রাদ্ধের আশা করিয়া থাকিয়া, শেষে নিষ্ফল রোদন লইয়া প্রেতলোকে ফিরিয়া যান। শ্রাদ্ধে যে সকল মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, তাহার শব্দ বিন্যাসে বায়ু-মণ্ডলে স্পন্দন উত্থিত হয়—ঐ স্পন্দনপ্রভাবে সূক্ষ্ম পদার্থ সকল পরিচালিত হইতে থাকে। মন্ত্রের উচ্চারণের শব্দ-শক্তি ও স্বর-কম্পন দ্বারা যে স্পন্দন উৎপন্ন হয়, তাহা প্রেত-শরীরে আঘাত করিয়া উহাকে স্পন্দিত করিয়া থাকে, এবং সেই স্পন্দনের ঘাত প্রতিঘাতে প্রেতশরীরের স্থূলাংশ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। যোগবলশালী ভারতীয় ঋষিগণ তদনুযায়ী করিয়াই মন্ত্রসমূহের শব্দ যোজনা করিয়া রাখিয়াছেন।

তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না ? আমি যাহা বলিব, তাহা অবিশ্বাস করিও না। আমি তোমাদের স্বার্থের

গণ্ডীর মধ্যে নাই—কোন কথাই বাড়াইয়া বা গোপন করিয়া বলিব না। কাচের দৃঢ় ফানুস—শব্দ উচ্চারণে ভাঙ্গিয়া যায়, দেখ নাই কি? সেও স্পন্দন দ্বারা ভাঙ্গে। মেঘের শব্দে—কামান-বন্দুকের শব্দে অনেকে মূর্চ্ছিত হয়, মরিয়া যায়। সেও স্পন্দন-শক্তিতে। একটা সামান্য কথায় লোকে হাসিয়া ফেলে বা কাঁদিয়া মরে—তাহাও শব্দের স্পন্দনে। সেইরূপ শব্দের বিশেষ প্রকার স্পন্দনপ্রভাবে সূক্ষ্ম প্রেত-শরীরও ভাঙ্গিয়া যায়। তবে মন্ত্রের উচ্চারণ ও শব্দবিন্যাস সঠিক ভাবে না হইলে কিছুমাত্র ফল হয় না।

চক্রে। আপনি বলিলেন; আপনার স্ত্রীকে যিনি মন্ত্র পড়াইয়াছিলেন, তিনি শক্তিবান নহেন, এ কথার অর্থ কি?

প্রেত। সে ব্রাহ্মণের অধ্যাত্ম-শক্তি কিছুমাত্র নাই। তিনি প্রেত-তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহেন। ঈশ্বরে দৃঢ়বিশ্বাসী বা সংযমী নহেন। শ্রাদ্ধ করিতে হইলে পুরোহিত নির্ব্বাচন বিশেষ প্রয়োজন।

শ্রাদ্ধক্রিয়া ব্যতীত আত্মীয়-স্বজনেরা বা পার্থিব যে কোন ব্যক্তি মৃতব্যক্তির আত্মার উদ্দেশে ভগবানের নিকট যে শক্তির প্রেরণা করেন, তাহাও ব্যর্থ যায় না। সুচিন্তা, সদ্ভাব ও সদিচ্ছা মৃত আত্মীয়ের উদ্দেশ্যে যাহা চালনা করিবেন, তদ্দ্বারাও তিনি প্রেতলোকে উপকারপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আবার অসদিচ্ছা ও অসৎচিন্তা প্রভৃতি কিম্বা অভিসম্পাৎ যাহা তাঁহার বিরুদ্ধে বর্ষিত হইবে, তাহাও প্রেতলোকে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে।

মনে কর, একজন দেশহিতৈষী বা দাতা ছিলেন, নানাপ্রকারে তিনি দশের উপকার করিতেন, তাঁহার মৃত্যুর পরে অধিকাংশ লোকে তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া যে অভাব অনুভব করে, তাহা সেই মৃতের পক্ষে পারিজাত পুষ্পবর্ষণ; ইহা দ্বারা তাঁহার আত্মার সমূহ উন্নতি হয়।

অপর একজন জাল-জুয়াচুরী করিত, লোককে মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমার কল-কৌশল শিক্ষা দিত, অথবা বেশ্যালয় গমন ও মদ্যাদি পান করিত, সে ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার সখা-সঙ্গিগণ সেই কাজের জন্য যে তাহাকে স্মরণ করে, তাহা তাহার পক্ষে নরকের স্বর্ণ শৃঙ্খল। ইহাতে তাহার আত্মাকে আচ্ছন্ন-প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সে যদিও ভোগান্তে উন্নতির পথে যায়, তথাপিও ঐ সকল পৃথিবীর চিন্তা তাহাকে টানিয়া আবার নিম্ন স্তরে আনয়ন করে। অভিসম্পাতে অনন্ত অন্ধকারে নিপাতিত করিয়া থাকে।

চক্রে। আপনার পিতামাতা স্ত্রী প্রভৃতির কথা এখনও কি বেশ মনে আছে ?

প্রেত। হাঁ, আছে।

চক্রে। তাঁহাদের জন্যে আপনার শোক বা দুঃখ হয় কি ?

প্রেত। কিসের জন্য শোক বা দুঃখ হইবে ? তাঁহারাও আছেন, আমিও আছি। ধ্বংস কাহারও নাই। আর এমন সম্বন্ধ অনেকের সহিত অনেকবার হইয়াছে ও হইবে। মৃত্যুর পর জীব সমস্ত জানিতে ও বুঝিতে পারেন। তাহার কারণ এই যে, স্থূলশরীরের অভাবে মনোময় দেহ, কাজেই তখন বাহ্যজগতের পরিবর্ত্তে অন্তর্জগতেই দৃষ্টি হয়।

চক্রে। আপনি এখনও কি আপনার স্ত্রী উষা, আপনার পিতা-মাতা ও সন্ধ্যা প্রভৃতির সংবাদ অবগত আছেন ?

প্রেত। হাঁ।

চক্রে। তাঁহারা কি কলিকাতাতেই আছেন ?

প্রেত। না, সে অনেকদিনের কথা। কেবল আমার পিতা এখনও জীবিত, তিনি কাশীবাস করিতেছেন। উষা, সন্ধ্যা, আমার মা, ইঁহারা পার্থিব দেহ ত্যাগ করিয়াছেন।

চক্রে। আপনার সহিত প্রেতলোকে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয় কি ?

প্রেত। আমার মাতার সহিত কয়েকদিন সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সন্ধ্যার সহিত দুইদিন সাক্ষাৎ হইয়াছিল, ঊষার সহিত মাত্র একদিন।

চক্রে। আপনার কার্ত্তিকঠাকুরদার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল ?

প্রেত। তাঁহার সহিত কয়েকদিন দেখা হইয়াছিল।

চক্রে। আপনার আর কোন পরিচিত আত্মীয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয় ?

প্রেত। তাহাও হয়। অনেক অপরিচিত আত্মিকও এখন আমার বন্ধুশ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছেন।

চক্রে। এই সকল বিষয় এখন আমাদিগকে শুনান।

প্রেত। কি শুনিবে, একে একে প্রশ্ন কর।

ষষ্ঠ উল্লাস।

কার্ত্তিকঠাকুরদা।

চক্রেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার মাতা, আপনার স্ত্রী, আপনার কার্ত্তিকঠাকুরদা ও সন্ধ্যার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিলেন, তাঁহাদিগকে আপনি চিনিলেন কি প্রকারে ?"

প্রেত। চিনিবার কোন প্রত্যবায় ঘটে না। যে বয়সে ও যেরূপ অবস্থায় মৃত্যু হয়, পরলোকে ঠিক সেই প্রকার দেহ থাকে—তাহার কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হয় না। তবে পৃথিবীতে স্থূল দেহ, আর ভুবর্লোকে সূক্ষ্ম দেহ, এইমাত্র প্রভেদ। নতুবা আর কিছুই পরিবর্ত্তিত হয় না ; এমন কি দেহের যেখানে যে আঁচিল বা যে চিহ্ন থাকে, মৃত্যুর পরে পারলৌকিক দেহেও তাহা বিদ্যমান থাকে। আরও এক কথা এই যে, পরলোকে ভালবাসার টান আরও অধিক হয়। দ্বেষ বা ঘৃণার অবস্থাও তদ্রূপ অধিক হয়। তবে কেহ কাহারও সহিত এখানকার মত ঝগড়া-বিসম্বাদ করিতে পারে না।

চক্রে। যে সকল আত্মীয় আমাদের আগে পরলোকে গমন করিয়াছেন, মৃত্যুর পরে আমরা তাঁহাদের সকলেরই দর্শন লাভ করিতে পারিব কি ?

প্রেত। তাহাতে সন্দেহ নাই ;—তবে একটি কথা আছে।

চক্রে। কি ?

প্রেত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সকলে পরলোকের সকল স্তরে যাইতে, সক্ষম নহেন। আপন আপন কর্ম্মফলে কে কোন্ স্তরে আছেন,

তাহার সন্ধান পাওয়া দুর্ঘট। আর যদি মর্ত্ত্যে পুনরাগমনপূর্ব্বক জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে সাক্ষাতে অন্তরায় বা বিলম্ব ঘটিতে পারে।

চক্রে। আপনার কার্ত্তিকঠাকুরদার সহিত কোথায় এবং কি অবস্থায় সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি আপনাকে কি বলিয়াছিলেন, শুনিতে ইচ্ছা করি।

প্রেত। প্রথম যে দিবস আমার যাতনাশরীর গঠিত হয় ও আমি ভুবর্ল্লোকের নিম্ন স্তরে যাইতে অধিকারপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই দিবস হঠাৎ একখানা রক্তাক্ত ছোরা আমার কণ্ঠদেশের সমীপবর্ত্তী হইয়া স্থির হইয়া রহিল। আমি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম—ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। কেহ কোথাও নাই—সর্ব্বত্র জনশূন্য। কে রক্ষা করিবে? চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিলাম, "কে আছ গো; আমায় রক্ষা কর। প্রাণ যায়—কিন্তু এ দেশের প্রাণ যাইবার নহে। উপায় কি? রক্ষাকর্ত্তা কি কেহ নাই?"

হা হা করিয়া কে পশ্চাদ্দিকে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিব, সে সাহসও হয় না, পশ্চাৎ ফিরিতে গেলে ছোরাখানা যদি গলদেশে বিঁধিয়া যায়।

আবার হাস্য—সেই বিকট হা হা স্বরে হাস্য! অনেক কষ্টে পশ্চাতে চাহিলাম—দেখিলাম, কার্ত্তিকঠাকুরদা! কিন্তু পৃথিবীতে যেমন বিকট-কঙ্কাল-অনল-প্রেত-মূর্ত্তি দেখিতাম, এখানে তাহা দেখিলাম না। যাহা তাঁহার স্বাভাবিক মূর্ত্তি—মৃত্যুর পূর্ব্বে যে মূর্ত্তিতে দেখিতাম, ঠিক সেই মূর্ত্তি। তিনি দাঁড়াইয়া হাসিতেছিলেন। আমি চাহিলে, হাসি বন্ধ করিয়া বলিলেন, "কেমন আছ, ভায়া?"

আমি নতশির হইয়া বলিলাম, "ছোরা কাহার? ভয়ে আমি কথা কহিতে পারিতেছি না।"

কার্ত্তিক। ছোরা তোমার সঙ্গিদিগের। ঐ ছোরা আমার কণ্ঠ ছিন্ন করিয়াছিল। মনে করিয়ো না, কলিকাতার কোন গলি হইতে সেই ঘাতকগণের হস্তবিচ্যুত ছোরাখানি কোন যমদূত গিয়া কুড়াইয়া আনিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে। উহা তাহার প্রতিকৃতি—চিন্তাব্যূহ।

আমি। কতক্ষণ এইরূপে থাকিবে ?

কার্ত্তিক। তাহা আমি জানি না, এ দেশের বুঝি কোন কিছু জানিবার নাই! কেমনই আশ্চর্য্য নিয়ম-শৃঙ্খলা—কেমনই বিধি-নির্দ্ধারিত কার্য্য—যাহা ঘটিবার, যাহা হইবার, তাহা আপনিই ঘটিতেছে, আপনিই হইতেছে। যাহাকে যাহা করিতে হইবে, সে তাহা আপনিই করিয়া চলিতেছে। এ দেশের বিধানগুণে নরক-জ্বালা লোকে বুক পাতিয়া গ্রহণ করিতেছে—জ্বলিতেছে, পুড়িতেছে, মরিতেছে—কিন্তু ফিরিতে পারে না। নিয়ম লঙ্ঘনে সকলেই শক্তিহীন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি নিহত হইয়াছিলেন, আপনি কোন পাপ করেন নাই, তবে আপনি যাতনাশরীর গ্রহণ করিয়া পিতৃলোকের এই নিম্ন স্তরে ঘুরিতেছেন কেন ?"

কার্ত্তিক। প্রাণপোরা আসক্তি ছিল, তাই ভায়া ; এ দুর্গতি।

আমি। কিসের আসক্তি ?

কার্ত্তিক। সন্ধ্যার রূপের। বৃদ্ধ বয়সে যদি শ্রীভগবানের নাম করিতাম, দান ধ্যান পূজা জপ করিতাম, তাহা হইলে কি এখন এই নরক বুকে করিয়া কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় দিক্ হইতে দিগন্তে ছুটিয়া ফিরিতাম! মৃত্যুকালে—যখন তোমার প্রেরিত ঘাতকগণ আমার ঘরে প্রবেশ করিল, তখনও আমি সন্ধ্যাকে ভাবিতেছিলাম। তখন আমি জানিতে পারি নাই যে, তোমার ও সন্ধ্যার পরামর্শে ও প্ররোচনায় তাহারা আমাকে হত্যা করিতে আসিয়াছে—আমি ভাবিয়াছিলাম

তাহারা দস্যু ; আমার ধন-রত্ন লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছে। সকল ধনের উপর আমার সন্ধ্যা-ধনে আসক্তি অধিক—পাছে সন্ধ্যার কোন অনিষ্ট হয়, ইহাই তখন আমার প্রাণের চিন্তনীয় হইয়াছিল। সেই চিন্তা করিবার সময়েই তাহাদের ভীষণ ছোরায় আমার মর্ত্ত্যলীলা সাঙ্গ হইয়া গেল। কাজেই একবার ভগবানকেও ডাকা হইল না।

আমি। ইহাতে এমন কি কঠিন পাপ হইয়াছে?

কার্ত্তিক। বড় কঠিন পাপ হইয়াছে ভায়া ;—সন্ধ্যার উদ্ধার না হইলে, আমার উদ্ধার নাই। মানব যাহাতে বা যে বিষয় চিন্তা করিতে করিতে স্থূলদেহ ত্যাগ করে, সূক্ষ্ম দেহ তদ্ভাবাপন্ন হয়। যাহাকে বা যে বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মরে—তাহার বা সেই বিষয়ের পাপ-পুণ্য ও আকর্ষণ-বিকর্ষণ এবং শক্তিমত তল্লোকবাসী হয়। সেইজন্যই ত পৃথিবীতে সর্ব্ববিষয়ে অনাসক্ত হইবার জন্য শাস্ত্রোপদেশ আছে। কেবলমাত্র নিজ নিজ ইষ্টদেবের স্মরণ, মনন ও সাধন আবশ্যক,—ইহাতে তদ্ভাবাপন্ন হইয়া মানব উচ্চ স্তরে উঠিয়া যাইতে পারে। কাম-কামনার দাসী সন্ধ্যাকে—বহুবল্লভা সন্ধ্যাকে—অসতী সন্ধ্যাকে চিন্তা করিতে করিতে মরিয়াছি—এখন তাহারই ভাবে এই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। সে আমাদের আরও নিম্ন স্তরে আছে—সে অহোরাত্র আমাকে টানে—সেই টানে—সেই পাপ-আকর্ষণে আমার ঊর্দ্ধলোকে যাওয়া ঘটে না। এইজন্য সাধ্বীস্ত্রীর স্বামী নিজের পাতকসত্ত্বেও স্ত্রীর টানে ঊর্দ্ধলোকে যায়। বেশ্যাসক্ত ব্যক্তি, কুলটার প্রণয়ী ব্যক্তি—তাহাদের পাপ-আকর্ষণে তাহাদের নারকীয় স্তরে নামিয়া পড়ে।

আমি। আপনি নিহত হইয়া কি পৃথিবীর সন্নিকটে প্রেত হইয়া ঘুরিতেন?

কার্ত্তিক। না, আমি ত আত্মহত্যা করি নাই। হত্যাকারীর

উপরে প্রতিহিংসাও ছিল না, সুতরাং পার্থিব আকর্ষণ অভাবে সেরূপ ঘৃণ্য দেহ প্রাপ্ত হই নাই।

আমি। আমি আপনার প্রেতদেহ সর্ব্বদাই দর্শন করিতাম।

কার্ত্তিক। বুঝিয়াছি ভায়া, সে তোমারই চিন্তা-দেহ। আমার খুনের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তোমার মন আমাময় হইয়া গিয়াছিল, তাই তেমন মূর্ত্তি দেখিতে। সেই মনই ত তোমাকে আমার পশ্চাতে—আমার বিচরণভূমি এই নরকভূমিতে টানিয়া আনিয়াছে। এখন তোমার-আমার—সকলেরই মনোময়দেহ। মন যেমন ভাবে গঠন করা আছে, দেহও তদ্রূপ হইয়াছে। আবার যেমন দেহ, বাস-স্থানও তদ্রূপ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

সপ্তম উল্লাস।

সন্ধ্যা।

এই সময়ে আমাদের অদূরে বামাকণ্ঠে কে চীৎকার করিয়া উঠিল। করুণ ও যাতনামাথা স্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "মরিলাম গো! এ দেশে কি কেহ নাই, যে আমার বুভুক্ষিত হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা বিদূরিত করে! আমার আসক্তির আগুনে একটু শান্তি-জল দান করে! কৈ সুরা? কৈ পুরুষের আদর-সোহাগ, কৈ সে কোমল-মদির-দৃঢ় স্পর্শ! কৈ সে মূল্যবান বসন-ভূষণ! দাও—দাও—অভাব আর সহ্য হয় না, অভাবের জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইলাম। বুকের ভিতর আসক্তির আগ্নেয়-গিরি, দিবানিশি নরকাগ্নি উদ্গীর্ণ করিতেছে—কে আছ, দেখিয়া যাও—কোন্ মন্ত্রে নিবারণ হয়, বলিয়া দিয়া যাও।"

স্বর যেন আমার পরিচিত। সেইদিকে চাহিয়া দেখিলাম, একটি স্ত্রীলোক; চিনিতে পারিলাম না। কার্ত্তিকঠাকুরদার মুখের দিকে চাহিলাম।

কার্ত্তিকঠাকুরদা মৃদু অথচ বিরক্তির হাসি হাসিয়া বলিলেন, "চিনিতে পার নাই?"

আমি। না।

কার্ত্তিক। তোমার প্রেত জীবনের বীজরূপা শক্তি—আমার নরক-বিচরণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী,—সন্ধ্যা।

আমি। সন্ধ্যা! আমি শুনিয়াছি, যে বয়সে—যে অবস্থায় জীবের মৃত্যু হয়, তাহার আকার প্রকার—ভাব—দৈহিকগঠন প্রভৃতি পর-লোকেও ঠিক তদ্রূপ থাকে। সন্ধ্যা কি ঐ?

কার্ত্তিক। হাঁ, মৃত্যুকালে সন্ধ্যার ঐরূপ আকৃতিই হইয়াছিল। আমি সন্ধ্যায় আকৃষ্ট—সুতরাং পর পর সন্ধ্যার সংবাদ অবগত আছি। তুমি সন্ধ্যার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লইলে,শ্যাম বিশ্বাস উহাকে তাড়াইয়া দেয়,তখন সন্ধ্যা ঘৃণ্য বেশ্যাপল্লীতে আশ্রয় লয়। মানুষ যাহা অভ্যাস করে, তাহা আর ভুলিতে পারে না। সর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়া গেল—জাতি গেল, কুল গেল, মান গেল,সম্ভ্রম গেল—বাড়ী ঘর দুয়ার সব গেল—তথাপি কুক্রিয়া গেল না; তথাপি চৈতন্য হইল না। পাপ-পথে এমনই মোহ! সন্ধ্যা সেখানে গিয়া পাপবৃত্তি পরিচালনা করিতে লাগিল—ভিক্ষা করিয়া মদ্য-পান করিতে লাগিল, ক্রমে কুৎসিত রোগে ধরিল—সর্ব্বাঙ্গে বিকৃত ক্ষত হইল, মস্তকের চুল উঠিয়া গেল—হাত-পায়ের আঙুল বাঁকিয়া পড়িল, গাত্রের চামড়া ও মাংস খসিল;—তারপরে হাঁসপাতালে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সুতরাং ঐ যে দেহ দেখিতেছ, উহা মৃত্যুকালেরই দেহ।

আমি। সন্ধ্যা অমন চীৎকার করিয়া কি চাহিতেছে?

কার্ত্তিক। চাহিতেছে—যাহার আসক্তি লইয়া মরিয়াছে। মদ, ভাল খাবার, পুরুষ-সঙ্গ।

আমি। এখানে ত সে সকল নাই জানে। বিশেষতঃ ভোগ করিবার উপযুক্ত স্থূল ইন্দ্রিয় কোথায়?

কার্ত্তিক। ভোগ করিবার ক্ষমতা নাই—আসক্তি আছে। উহাই এ জগতের সাজা। ঐ সাজা লইয়াই নরক! ও যে কি তীব্র দহন, বোধ হয়, তাহা কিছু কিছু জানিতেছ। একটু অপেক্ষা কর—সন্ধ্যার মুখে তাহার যাতনা—তাহার কাহিনী সমস্ত শুনিতে পাইবে। সন্ধ্যা এই দিকেই আসিতেছে।

আমি। আপনি আগে বলিয়াছিলেন, সন্ধ্যা আরও নিম্ন স্তরে আছে, কিন্তু আ'জ এখানে আসিল কি প্রকারে?

কাৰ্ত্তিক। নিম্ন স্তরের প্রেত তাহার ঊর্দ্ধ স্তরে মধ্যে মধ্যে যাইতে পারে—ইহাই ক্রমবিবর্ত্তন।

এই সময় উন্মাদিনীর মত ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যা আমাদের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঔপদংশিক ক্ষত—ক্ষতমুখে রুধির-ধারা। মস্তকে একটি চুলও নাই—উঠিয়া গিয়াছে। চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট—দেহ কঙ্কাল-সার—গাত্র-গন্ধে চতুর্দ্দিক ন্যক্কারজনক করিয়া তুলিয়াছে।

তাহার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইল; কারণ, আমি ও কার্ত্তিকঠাকুরদা পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলাম, কিন্তু আমাদিগকে সে চিনিতে পারিল না, আমাদের নিকট দিয়াই চলিয়া যাইতেছিল। আমি ডাকিলাম, "সন্ধ্যা!"

সন্ধ্যা একটু থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার প্রেত-বাহু প্রসারণ করিয়া যেন কি খুঁজিল। তারপরে ধীরে ধীরে বলিল, "কে? কে তুমি? তোমার স্বর যেন আমার পরিচিত। ওঃ, তুমি মধুসূদন! অকৃতজ্ঞ—পাষাণ মধুসূদন!"

আমি। হাঁ, আমি মধুসূদন। এখানে তোমার স্বামী কার্ত্তিক-বাবুও আছেন।

সন্ধ্যা হা হা করিয়া বিকট হাসি হাসিয়া উঠিল। তাহার সেই নারকীয় হাসি সমস্ত নরক-ভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। তেমন বিকট-বিভৎস হাসির স্বর জীবনে আমার কর্ণগোচর হয় নাই। হাসিতে আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, কার্ত্তিকঠাকুরদা চমকিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

হাসি থামিল। সন্ধ্যা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিল, তারপরে সে চলিয়া যাইতেছিল। আমি ডাকিলাম, সন্ধ্যা দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কার্ত্তিকঠাকুরদা তোমার স্বামী নহেন কি?"

বিকৃতস্বরে সন্ধ্যা বলিল, "স্বামী হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা—দেবতা—হাঃ হাঃ, তাহা হইলে আর ভাবনা কি ছিল! তেমন হৃদয় সন্ধ্যার নহে। সন্ধ্যা প্রাণ একমুখী করিতে শিখে নাই। স্বামী-দেবতাকে কখনও পূজা বা ধ্যান করে নাই। সন্ধ্যা পাষাণী—নরক-ভূমিতে এইরূপেই নৃত্য করিয়া ফিরিবে।"

আমি। এখন ত সকলই বুঝিতেছ, এ জগতে আমাদের সকলেরই অন্তর্দৃষ্টি—অতএব সাবধান হইতে চেষ্টা কর।

সন্ধ্যা। তুমি যেন এ জগতের লোক নহ। এখানে স্মৃতির দংশন আছে, অব্যাহতি নাই। এ জ্বালা ভোগের দ্বারাই ক্ষয় হইবে। ভোগ করিতে দাও—জ্বলিতে দাও। কৈ মধু,—সেখানে বোতল বোতল মদ দিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ—এখানে একটু দিতে পারিবে কি? প্রাণ যে আসক্তির আগুনে জ্বলিয়া গেল—পুড়িয়া গেল—শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল।

আমি। সন্ধ্যা, সে সকল পাইলেই বা তুমি ভোগ করিতে পারিবে কেন? আমরা এখানে আছি, স্পর্শ কর দেখি।

সন্ধ্যা। না—না—তাহা পারিব না। তোমার মত শত পুরুষের অনল-মূর্ত্তি আমার প্রাণের মধ্যে বসান হইয়াছে, প্রতি নিশ্বাসে নিশ্বাসে তাহাদের স্পর্শে পুড়িয়া মরিতেছি। চলিলাম—এক স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারি না। কে যেন 'জল-বিছুটী' দিয়া তাড়াইয়া লইয়া ফিরে।

অষ্টম উল্লাস।

নরকোৎসব

আর একদিনের কথা বলিব। দিক্‌ভ্রান্ত পথিকের মত আমি ঘুরিতে-ছিলাম, সহসা আমার চারিদিকে অসংখ্য নরনারীর কাতর-কণ্ঠের করুণ ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। আমার অতি নিকটে—দক্ষিণ পার্শ্বে পুরুষ-কণ্ঠে কে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "আর ত পারি না। কতকাল আর অনন্তপিপাসার আগুন বুকে করিয়া এই নরকভূমিতে বিচরণ করিব! পিপাসা—অসীম—অতলস্পর্শী—সীমাহারা—"

চাহিয়া দেখি, সুন্দর এক যুবা পুরুষ। আকৃতি দেখিলে বড়ঘরের সন্তান বলিয়া জ্ঞান হয়। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি মহাশয়, আপনার কিসের পিপাসা?"

জ্বলিতকণ্ঠে, কাতর-উন্মাদ-স্বরে তিনি বলিলেন, "মদ, বেশ্যা। পার্থিবজীবনে যাহা লইয়া দিন কাটাইয়াছিলাম। দান-ধ্যান পূজা ব্রত সব ভুলিয়া গিয়াছিলাম—ঈশ্বর বলিয়া কেহ আছেন, তাহা কোনদিন মনেও করি নাই। তারপরে একদিন বেশ্যালয়ে ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ হয়। তদবধি—এইরূপেই ঘুরিয়া মরিতেছি। প্রথমে দিন-কতক বেশ্যাবাড়ীর দ্বারে দ্বারে—মলমূত্র পরিত্যাগের স্থানসমূহে ঘুরিয়া ফিরিয়াছি—তারপরে ক্রমোন্নতির বলে এই পর্য্যন্ত আসিয়াছি। তথাপি কিন্তু সে ভোগের আনন্দ বিস্মৃতি হইতে পারি না। জানি, সেই মহা-পাতকের এই প্রায়শ্চিত্ত—তথাপি ত্যাগ করিতে পারি নাই। কত-দিন এই অসহ্য পিপাসার জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া যাহারা বেশ্যা-

সক্ত—যাহারা মদ্যপ, তাহাদের শরীরে প্রবেশ করিয়া মদ্যপান ও বেশ্যা-সংস্পর্শ সুখ অনুভব করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু তাহাতে কি হয়, পিপাসা যে দেহযোড়া—ইহা ত যাইবার নহে।"

আর একজন বলিয়া উঠিলেন, "ওগো, আমার দুঃখ শোন। আমি এক ধনীর সন্তান। আমার পার্থিবজীবনে কত সুখ ছিল, কত দাস-দাসী ছিল, আমি নিজ হাতে কাপড় পরিতাম না—ভৃত্য পরাইয়া দিত। আমার হুকুমে সহস্র লোক খাটিত। আমি মানব-স্কন্ধে—পাল্কীতে গমন করিতাম, এখানে আসিয়া সে সকল পাইতেছি না। কেহ আমার কথা শুনে না—কেহ কাহারই কথা শুনে না। সকলেই স্বাধীন—সকলেই আপন আপন কর্ম্মফল লইয়া ব্যস্ত। সেজন্য আমার অসীম দুঃখ। অধিকন্তু ধন-গর্ব্বে আমি যাহাদিগকে কষ্ট দিয়াছি—আশ্রয় শূন্য করিয়াছি—ঋণদায়ে জড়াইয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছি, তাহারা আমাকে নানাবিধ ভাবে কষ্ট দিতেছে—বিভীষিকা দেখাইয়া তাড়াইয়া ফিরিতেছে। কোথায় যাই? কে রক্ষা করে?"

কাঁদিতে কাঁদিতে অপর একজন বলিতে লাগিলেন, "মরিলে সকল জ্বালা যায়, এই বিশ্বাসে—পার্থিব বহু জ্বালা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আত্মহত্যা করিয়াছিলাম। ওগো, আত্মহত্যার এমন যন্ত্রণা—তা ত আগে জানি নাই। কত দীর্ঘ বৎসর—কত দীর্ঘ যুগ অতীত হইয়া গেল, তথাপি আমার মহাপাতকের অবসান হইল না। সেই যে আত্ম-হত্যা করিয়াছিলাম, সেই আত্মহত্যার পরে প্রায় চল্লিশ বৎসর পৃথিবীর উপরে প্রেত হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিয়াছি। তারপরে কঠোর দণ্ড—আরও কঠোর দণ্ড! কিয়দ্দিবস আসিয়া এই প্রেতভূমিতে আত্মানু-শোচনা করিয়া ফিরি—আবার জন্মিতে যাইতে হয়, কিন্তু জন্ম-মৃত্যুর যন্ত্রণা একযোগে ভোগ করিয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। দশ মাস দশদিন

গর্ভবাসের অসীম ক্লেশ সহ্য করিয়া যেমন প্রসূত হই—অমনি মৃত্যু আসিয়া শিয়রে বসে। আঁতুরেই মৃত্যু হয়। এমনি করিয়া কত যুগ ঘুরিতেছি। দয়া করিবার কেহ নাই—মুখ চাহিবার মানুষ নাই।”

নারীকণ্ঠে একজন চীৎকার করিতে করিতে আমাদের নিকট দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। বোধ হইল, সে অন্ধ। টিপিয়া টিপিয়া পা ফেলিতে ফেলিতে চলিতেছিল। ভগ্ন-কাতর-করুণ-স্বরে বলিতে বলিতে চলিয়াছে, “কে আছ গো, আমায় বলিয়া দাও, আর কত কাল এই নরক-ভূমিতে বিচরণ করিব? আর কত কাল এই নরক-জ্বালা সহ্য করিব! এ দেশে কি মার্জ্জনা নাই—ক্ষমা নাই! কোন্ কালে—কোন্ দিনে পতি-দেবতাকে লঙ্ঘন করিয়া পরপুরুষের দিকে মাত্র চাহিয়াছিলাম, তাহাতেই কি এত দীর্ঘ দিবস যাতনা পাইতে হয়! এমন জানিলে পৃথিবীতে খুব সাবধান হইতে পারিতাম। তখন ভাবিতাম, শাস্ত্র-উপদেশ সমাজশাসনের জন্য। তখন বুঝিতাম, সংযম-সাধনা লোকযাত্রা সুন্দর রূপে নির্ব্বাহের জন্য। তখন বিচারে স্থির করিতাম, গুরু-পুরোহিতের শুষ্ক উপদেশ, তাঁহাদের স্বার্থ-সাধনার ষড়যন্ত্র জন্য। এখন—এই দীর্ঘ-কাল ধরিয়া ভুগিয়া ভুগিয়া জানিতে পারিতেছি, পৃথিবীর কর্ম্ম এতটুকুও নিষ্ফল যায় না। মর্ত্ত্যের কর্ম্মশক্তি এখানকার দেহ—এ দেহ মর্ত্ত্যে বসিয়া গড়িয়া রাখা হয়। এবার যদি মর্ত্ত্যে যাইতে পারি, আবার যদি মর্ত্ত্যের স্বাধীন-দেহ প্রাপ্ত হই, কখনই পাপ করিব না। কিন্তু এবার-কার উদ্ধারের উপায় কি? আমি অন্ধ নহি—চক্ষু আছে, কিন্তু চাহিতে পারি না। চক্ষুর মধ্যে সেই পুরুষের অনল-মূর্ত্তি—চাহিতে গেলেই সেই ভীষণ অগ্নিতাপে চক্ষু ঝলসিয়া যায়। সেই আগুনের হল্কা আসিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত দগ্ধ করে। কোথায় যাইগো, পথ কোথায়?”

আর একজন স্থূলকায় পুরুষ ধীরে ধীরে চলিতেছিলেন। দেখিয়াই

চিনিলাম, তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি—মর্ত্ত্যভূমিতে গুরু-পুরোহিতের ব্যবসায় করিতেন। তাঁহার মুখে অনেক কথা শুনিতে পাইলাম। তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বহু ব্যক্তি চলিয়াছে। কেহ দীর্ঘ বাহু প্রসারণপূর্ব্বক তাঁহাকে চাপিয়া ধরিতে চেষ্টা করিতেছে। কেহ দীর্ঘ অঙ্গুলীর দীর্ঘ নখর দিয়া তাঁহার চক্ষু উপাড়িয়া দিতে চেষ্টা করিতেছে। কেহ তাঁহার মস্তকের শিখা ধরিয়া টানিবার জন্য ধাবিত হইতেছে। কেহ দন্ত বাহির করিয়া তাঁহাকে দংশন করিতে উদ্যত হইতেছে। পণ্ডিতটি নিজ দেহ-ভার লইয়া ভীত-চকিত-কাতর ভাবে চলিয়া যাইতেছেন। মুখের ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, ভয়ে তাঁহার বড় কষ্ট হইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে মহাশয়? তিনি বিরক্তিস্বরে বলিলেন, "কেন, সে পরিচয় লইয়া তুমি কি করিবে?" তাঁগার পশ্চাতস্থ এক ব্যক্তি বিকট হাসি হাসিয়া বলিল, ইনি আমাদের কতক লোকের পুরোহিত। অনেকের গুরু, আবার কাহারও কাহারও গুরু-পুরোহিত উভয়ই। ইনি শাস্ত্রপন্থা পরিত্যাগ করিয়া এক নবধর্ম্মের মত আমাদের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। শাস্ত্র বলিয়া অশাস্ত্রীয় মতে আমাদিগকে পরি-চালিত করিয়াছিলেন। ঈশ্বর বলিয়া এক মানবকে ভজনা করিতে শিখাইয়াছিলেন, সেই মহাপাতকে আমাদের নরকবাস নির্ণীত হই-য়াছে, আর ঐ হতভাগ্যেরও নরক হইয়াছে। এখানে আমরা আমা-দের নরকের কারণ ঐ পাপমতিকে জড়াইয়া আছি। ঐ ব্যক্তি যে দিকে যায়, আমরা দিবানিশি উহার অনুবর্ত্তন করিয়া থাকি। যতদূর সাধ্য, আমরা উহার কৃতকর্ম্মের প্রতিশোধ লইবার জন্য চেষ্টা করি-তেছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কতদিন ধরিয়া এইরূপ চলিতেছে? সে ব্যক্তি বলিল, ঠিক স্মরণ করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু আমার যখন মৃত্যু হয়, তখন ভারতবর্ষে ঔরঙ্গজেব বাদশাহের রাজত্ব ছিল।

আমার অনেক পূর্ব্বে আমাদের পুরোহিতরূপী এই পিশাচের মৃত্যু হয়। যত লোককে ইহার পশ্চাতে ধাবিত হইতে ও ইহার প্রতি অত্যাচার করিতে দেখিতেছ, ইহারা সকলেই এই ব্যক্তির যজমান বা শিষ্য এবং ইহার দ্বারা প্রতারিত। সকলেই ক্রমে ক্রমে মৃত্যু-মুখে নিপতিত হইয়াছে, আর ইহাকে আসিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছে। সকলেরই এক সঙ্গ—এক সঙ্গে নরকবিহার। আর কত কাল যে এই নরকভোগ অদৃষ্টে আছে, জানি না।

চারিদিক হইতে এইরূপ প্রেত-ক্রন্দনে দিগন্ত মুখরিত হইয়া উঠিল। আমি প্রেতলোকে আসিয়া কোনদিন এমন কাণ্ড দেখি নাই, এত আত্মিকের একত্র সমাবেশ কথনও দর্শন করি নাই। আজ হঠাৎ এরূপ দেখিয়া আমি বড় বিচলিত হইয়া পড়িলাম। সকলের কাতর-ক্রন্দনে আমি নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িলাম। আমার বোধ হইল, সেদিন যেন সেখানে নরকোৎসব হইতেছিল। কোন মেলা বা উৎসব দর্শনে যেমন নরনারী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দলে দলে উদ্দেশ্য পথপানে আপন মনে চলিয়া যায়, তেমনি যাইতেছিল।

ইহার মধ্যে এক সৌম্যমূর্ত্তি আত্মিকের দর্শন পাইলাম। তাঁহার আকৃতি প্রশান্ত—দীর্ঘ ও পুণ্যময়। তিনি উর্দ্ধলোকবাসী—কৃপা করিয়া পাপীদিগকে শান্ত্বনা দান করিবার জন্য ও উদ্ধারের উপায় বলিয়া দিবার জন্য তথায় আগমন করিয়াছিলেন। প্রেতলোকে এরূপ মহাপুরুষের আগমন মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে।

তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম, সেদিন কার্ত্তিকী চতুর্দ্দশী—ভূতচতুর্দ্দশী। আত্মিকগণের পার্থিব কুটুম্বগণ উল্কাদান করায় তাহারা আপন আপন স্তর হইতে কিছু কিছু উর্দ্ধ স্তরে যাইতেছে। মনে হইল, পৃথিবীতে থাকিতে এ সকল কার্য্যকে বালক-ভুলান কার্য্য

বলিয়া জ্ঞান করিতাম, এখন দেখিতেছি—প্রেত-জীবনের ইহা অমৃত-আলোক।*

---

* কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে প্রদোষে প্রেতোদ্দেশে উল্কাদান করিতে হয়। এই ক্রিয়াতে—প্রেতের যাতনাদেহ ধ্বংস হইতে পারে। ইহার মন্ত্রাদি পাঠ করিলে সমস্ত অবগত হইতে পারা যায়।

উল্কাগ্রহণ মন্ত্র—

শস্ত্রাশস্ত্রহতানাঞ্চ ভূতানাং ভূতদর্শয়োঃ।
উজ্জ্বলজ্যোতিষা দেহং দহেয়ং ব্যোমবহ্নিনা॥

উল্কাদান মন্ত্র—

অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধা কুলে মম।
উজ্জ্বলজ্যোতিষাদগ্ধ্যাস্তেযান্তু পরমাং গতিম্॥

বিসর্জ্জন মন্ত্র—

যমলোকং পরিত্যজ্য আগতা যে মহালয়ে।
উজ্জ্বলজ্যোতিষা বর্ত্ম প্রপশ্যন্তো ব্রজন্তুতে॥

নবম উল্লাস।

প্রতিঘাত।

সহসা সে সকল আর্ত্তনাদ—করুণ-ক্রন্দন থামিয়া গেল। আমি ভয়-চকিত-নয়নের কাতর-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম—আর কেহ সেখানে নাই। সব নিস্তব্ধ—সব শূন্য। আমি চলিয়া যাইতে-ছিলাম, কি সর্ব্বনাশ! কি প্রাণান্তকর যন্ত্রণা! কি ভয়াবহ দৃশ্য! আমার চতুর্দ্দিকে রক্ত-ছোয়া ছুলিতেছিল। বায়ু অগ্নির ন্যায় আসিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ দহন করিতেছিল। আমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া গেল, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছিলাম, কিন্তু মূর্চ্ছা হইল না।

পশ্চাদ্দিকে হা হা করিয়া কে বিকট হাসি হাসিল। চমকিয়া চাহিয়া দেখিলাম, সন্ধ্যা! সন্ধ্যার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া পূয-রক্ত স্রাব হইতেছে। ক্রিমিকীট সকল তাহাতে দংশন করিতেছে। হাতের কয়েকটি আঙুল গলিয়া গিয়াছে, মুখ-ক্ষত হইয়া ওষ্ঠের কিয়দংশ খসিয়া পড়িয়াছে। গায়ের গন্ধে তিষ্ঠান দায়, সে তাহার পূতিগন্ধপূর্ণ পূয-রক্তমাখা প্রেত-বাহু বিস্তার করিয়া আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। আমাকে তাহার বাহু-বন্ধনে পিষিয়া মারিবে, ভয়ে আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। কোথায় যাই—কে রক্ষা করে!

আমি ছুটিয়া পলাইতেছিলাম। সন্ধ্যা করুণ-চীৎকারে ডাকিয়া বলিল, "দাঁড়াও, দাঁড়াও—পলাইয়ো না। এস, বাহু-বন্ধনে এস। এ বাহুর বন্ধন কত ভালবাসিতে! কুসুম-শয্যা হইতে এ বাহু-শয্যা তোমার সমধিক প্রিয় ছিল। এস প্রিয়তম ;—এস বঁধু ;—এস নরকের বীজ-বিধাতা ; আজ তোমায় লইয়া নরকোৎসব করি।

আমি দৌড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। কিন্তু দৌড়িবার সাধ্য কোথায়? স্বপ্নে ভয় পাইলে যেমন দৌড়ান যায় না, এ জগতেও তাহাই। স্বাধীনতা মাত্র নাই। অনেক কষ্টে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিয়া চাহিলাম। তখনও সন্ধ্যা সেই স্থানে দাঁড়াইয়া।

আমি তাহার দিকে চাহিবামাত্র সে আবার বিকট হাস্য করিল। একবার উৰ্দ্ধদিকে চাহিল। তাহার নরক-বাহু আমাকে যেন বুকে লই-বার জন্য প্রসারিত করিল। নয়নে দানবী-দীপ্তি জ্বলিয়া উঠিল। তার পরে কাতর-উন্মাদ-কণ্ঠস্বরে বলিল, "এস এস, বঁধু এস। আমার নর-কোৎসবের কৃমির মালা, আমার মহাপাতকের মেরুদণ্ড, আমার প্রেত-জীবনের শক্তিশেল, আমি তোমায় ছাড়িব না। কে আমাকে প্রথমে পাপের পথে নামাইয়া লয়?—তুমি। কে আমাকে নরক-মন্ত্রে দীক্ষিত করে?—তুমি। কে আমাকে স্বামীহত্যার ষড়যন্ত্রে মিলাইয়া লয়?—তুমি। হিন্দু বিধবাকে কে মদ-মাংস ভক্ষণে দক্ষ করিয়াছিল?—তুমি। কে আমার সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইয়া বেশ্যাপল্লীতে দাঁড় করাইয়াছিল?—তুমি। এক কথায় নরকের পিশাচী প্রস্তুত করিয়া আমাকে যুগযুগান্তর এই ভীষণ শাস্তি প্রদান কে করিয়াছে—তুমি। তবে তুমি পলাইবে কেন?

এস,—আমার বাহু-বন্ধনে এস। এস, নরকে—ভীষণ নরকে দুই-জনে তেমনি করিয়া শয়ন করি। যখন মর্ত্তাভূমির উজ্জ্বলিত চন্দ্রালোকে কুসুমগন্ধপূর্ণ সুখ-শয্যায় এ বাহু-বন্ধনে শয়ন করিয়াছ—তখন আ'জ এই নরকোৎসবের দিনে পূতিগন্ধপূর্ণ অনল-শয্যায় না শুইবে কেন?

আমি বলিলাম, "সন্ধ্যা, এখন তুমি ও আমি সব বুঝিতেছি—ভীষণ শাস্তি লইয়া দিনরাত্রি ছুটাছুটি করিতেছি। আর পাপ বৃদ্ধি করিয়ো না। মন হইতে সে সকল চিন্তা দূর করিবার চেষ্টা কর—ভগবানকে স্মরণ কর। তাঁহার দয়াল নামে ক্রমে উদ্ধার হইতে পারা যাইবে।"

আবার হাসি—সেইরূপ বিকট হাসি হাসিয়া উন্মাদ-কণ্ঠে সং বলিল, "ভগবান! ভগবান কি আছেন? এখনও আমি তাহা বুঝি পারি নাই। আমার এখনও বোধ হয়, ভগবান—একথা উপহাস বিদ্রূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঘাতকের ছুরি যখন নিষ্পা নিদ্রিতের বুকে প্রবেশ করে—তখন জগৎযোড়া চক্ষু লইয়া ভগবানচন্দ্র কোথায় থাকেন? সে ছুরি কাড়িয়া লইবার শক্তি কি সেই অনন্ত-শক্তি-মানের নাই? শ্রীভগবান স্ত্রী-পুরুষ গড়িয়াছেন—তাহাদের বুকে ভাল-বাসার আগ্নেয়গিরি জ্বালিয়াছেন, কিন্তু তাহা শান্তির কি উপায় করিয়া-ছেন? এ লালসায়—এ বহ্নি-স্রোতে—পুরুষ যখন রমণীর সর্ব্বনাশ করিতে আইসে, তখন ভগবান কেন অলঙ্ঘ্য-শৈলের মত তাহাদের মধ্যে প্রাচীর হইয়া দাঁড়ান না? যাক্—তুমি এস। এখন অসময়ে ভগবানের কথা ভাবিতে বলিতেছ, কিন্তু তখন সে উপদেশ দাও নাই। কৃতঘ্ন—আমার বুভুক্ষিত অতৃপ্ত পিপাসিত নরক-হৃদয়ে ডুবিয়া প' কে আছ? কে আছ মরণের-নরকের ভীষণ কিঙ্কর; এই অবিশ্ব নরঘাতককে বুঝাইয়া দাও, মানুষ মরিলেই সব ফুরায় না।"

আমি কি বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু সব ভুলিয়া গেলাম। ... আমার দেহ যেন চুর-মার হইয়া যাইতে বসিল। আমার পার্শ্ব হইতে কার্ত্তিকঠাকুরদা হো হো করিয়া বিকট হাস্ত করিতে করিতে হাততালি দিয়া উঠিল। আমি সেদিকে চাহিতে গেলাম—ঝন্ ঝন্ করিয়া ছোরায় ছোরায় ঠোকাঠুকি লাগিল। আমার কণ্ঠ—আমার বক্ষ—আমার পৃষ্ঠ—আমার মস্তক—সেই সকল ছুরিকা স্পর্শে ক্ষত-বিক্ষত হই গেল। আমি লুঠিয়া পড়িলাম।

যেখানে পড়িলাম, সেখানে আগুনের ভীষণ তাপ। উঠিতে গেলাম —পারিলাম না। ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম। জ্ঞানও বুঝি ছিল না।

দশম উল্লাস।

গন্ধর্ব্বকন্যা।

আমি যেখানে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলাম, হঠাৎ সেই উত্তপ্ত স্থান শীতল হইয়া আসিল, এবং অননুভূত সুখপ্রদ বলিয়া আমার জ্ঞান হইতে লাগিল। বসন্তের দুর্ব্বায় শিশির-সম্পাতের মত সে স্থান যেন অতি কোমল জ্ঞান হইতে লাগিল। আশ্চর্য্য হইয়া চারিদিকে চাহিলাম—কেহ কোথাও নাই। সন্ধ্যা নাই, কাত্তিকঠাকুরদা নাই, ছোরা নাই বা কোন আত্মকের সাড়া-শব্দ নাই। আমার অত্যন্ত আরামজ্ঞান হইতে লাগিল। সহসা উঠিলাম না—কত দীর্ঘ দিবসের পরে—কত যাতনাভরা ক্ষণমুহূর্ত্তের পরে যে একটু শান্তি পাইয়াছি, উঠিলে তাহা যদি নষ্ট হইয়া যায়, কাজেই উঠিলাম না। নিস্তব্ধে শুইয়া রহিলাম।

সহসা কোথা হইতে গানের স্বর আসিয়া আমার মর্ম্ম-মাঝে প্রবেশ করিল। সে স্বরে আমার হৃদয়ের প্রতি গ্রন্থি শিথিল হইয়া পাড়তে লাগিল। স্থির কর্ণে শুনিতে লাগিলাম।

ক্রমে স্বরের সহিত গানের কথাও বুঝিতে লাগিলাম। বোধ হইল, গায়ক বা গায়িকা ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতেছে।

ক্রমে স্পষ্ট—আরও স্পষ্টতর হইতে লাগিল। আমি স্থিরকর্ণে শুনিতে লাগিলাম, গীত হইতেছিল;—

হৃদয় ভ'রে কাঁদি একবার;
আজি বহুদিন পরে, কি জানি কি ক'রে,
শুকানো নয়নে অশ্রু এসেছে আবার।

প্রতি মৃত-সুখ লহ এক বিন্দু—
সাধমাখা—সাধ-অপূরাণ সিন্ধু,
লহ নিশীথ-কাতরা
শত আঁখি-ঝরা—
হৃদয়-আসার।

আমার বলিতে যদি পুণ্য থাকে,
হে সমীর, তাহা দিয়ে এস তাকে,
একে একে ক'রে
স্নেহে গলা ধ'রে
মুছে দিয়ো স্বেদমাখা সে মুখ-আঁধার।

প্রথম প্রেমের অধর মিলন, আন সে মোহিনী গান—
সেই ঘুমে জড়া রেতে, ঢুলু ঢুলু চোখে, ঘুমান হাসির তান—
সেই সোহাগ করিতে কেঁদে ফেলা আঁখি,
সেই ভাষা নাহি পাওয়া চেয়ে থাকা-থাকি,
সেই সব নিয়ে,
ব্যবধান দিয়ো ধুয়ে,
মিশাইয়া অভাগীর সতীত্ব-নীহার।

দপ্ করিয়া জ্যোৎস্না জ্বলিয়া উঠিল—দিকে দিকে সুরভি-সমীর প্রবাহিত হইল। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

অপূর্ব্ব দৃশ্য! অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! হৈম-কলসে জ্যোৎস্না জ্বলিলে তাহার যেমন শোভা হয়—চারিদিকে তেমনই শোভা বিকীর্ণ হইয়াছে। সূর্য্যাস্তের সময় তোমরা দিক্‌বধূর অঙ্গে যেমন বর্ণ দেখিয়া থাক, চার দিকে তেমনি বর্ণ-মাধুরীমা প্রকাশিত হইল। বাতাস যেন আরও সূক্ষ্ম, আরও শীতল, আরও মধুর এবং অজানা কুসুমগন্ধামোদিত।

আর আমার দেহ, তাহাও হাল্কা—পবিত্র—ঝরঝরে। কোথা,

হইতে যেন আনন্দ ভাসিয়া আসিয়া আমার হৃদয় পূর্ণ করিতেছিল। চারিদিকে সঙ্গীতের সুস্বর—তেমন আনন্দ, তেমন মধুর ভাব, আমি জীবনে কখনও অনুভব করি নাই।

আমি বিস্মিত ও পুলকিত হৃদয়ে চারিদিকে চাহিতেছি, এমন সময় দেখি, এক জ্যোতির্ম্ময়ী রমণী সেই স্থান দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার দেহ যেন জ্যোৎস্না দিয়া গড়ান—গাত্রগন্ধে দিগঙ্গনা পুলকিত। রমণী ধীর-মন্থর গমনে চলিয়া যাইতেছিলেন। আমি সভয়ে ডাকিলাম, "মা!"

রমণী দাঁড়াইল। তাঁহার লুলিত-কুন্তল রক্তচরণে স্পর্শ করিল। কৃষ্ণতার নয়ন আমার দিকে ফিরাইয়া বলিলেন, "নবাগত অতিথি তুমি। প্রেতলোকের যাতনা-দেহ ক্ষয় করিয়া এই মাত্র গন্ধর্ব্বলোকে আগমন করিয়াছ, এস এস, বাছা এস।"

আমার জ্ঞান হইল। বুঝিলাম, আমার প্রেতদেহ ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। যখন পড়িয়াছিলাম—তখনই শেষ হইয়াছে। কিন্তু কেমন করিয়া এ জগতে আসিলাম! বিস্মিত মনে তাহাই চিন্তা করিতেছিলাম। রমণী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "পারলৌকিক জগতে এইরূপেই কাজ হয়। কখন কি হয়, কিছুই বলা যায় না। তবে একেবারেই যে অর্থশূন্য—বিচারশূন্য, তাহা নহে।"

আমি করুণার্ত্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কে মা?"

রমণী। আমি গন্ধর্ব্বকন্যা।

আমি। আমি এখন কোথায় অবস্থান করিতেছি?

রমণী। গন্ধর্ব্বরাজ্যে, স্বর্গের নিম্ন স্তরে।*

* পাশ্চাত্যগণের মতেও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, স্বর্গের নিম্ন স্তরে এক জাতীয় জীব (Entities) বাস করেন,এবং তাঁহারা সঙ্গীতের দ্বারাই আত্মপ্রকাশ করিতে সক্ষম।

আমি। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে আমি যাতনাময় দেহে প্রেতরাজ্যে বিচরণ করিতেছিলাম, সহসা কোন্ পুণ্যবলে এবং কি ভাবে এ স্থানে আগমন করিতে সক্ষম হইলাম, যদি সন্তানের প্রতি করুণা করিয়া তাহা বলেন, কৃতার্থ হই।

গন্ধর্ব্বকন্যা। মানব যে পাপ করে, প্রেতলোকে তাহার ভোগ হয়, তোমারও ভোগ হইয়াছিল। তারপরে এক প্রবল আকর্ষণে তোমার সেই ভোগ শীঘ্র ক্ষয়ের প্রয়োজন হয়, তাই এককালে সন্ধ্যা প্রভৃতি তোমার নিকটস্থ হইয়া যাতনা দেয়। মানুষের কামনা ও বাসনা দ্বারা যে ভুবর্ল্লৌকিক দেহ গঠিত হয়, ভুবর্ল্লোকে বা প্রেতলোকে বসতি-কাল পর্য্যন্ত সে দেহ থাকে, তারপরে সে দেহ ও স্বভাব ভোগের দ্বারা ক্ষয় হইয়া যায় এবং উত্তম চিন্তাদি দ্বারা উন্নত মানসদেহ প্রকাশ পায়। তখনই সে তাহার দেহের উপযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হয়।

দেখ, মর্ত্ত্যলোক বল, প্রেতলোক বল, আর স্বর্গলোক বল, সর্ব্বত্রই কুচিন্তা, কদাচার, কুভাব অথবা সুচিন্তা, সদাচার, সুভাব প্রভৃতি প্রদান করিতে অপরে সক্ষম হয়। মহাপাতকীও সৎসঙ্গে বা সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে সাধু হয়, আবার দেবতার ন্যায় চরিত্র ব্যক্তিও অসতের সংসর্গে দানব সাজিয়া বসে। তোমাকে স্বর্গে লইবার জন্য এক সতীকন্যা দিবা-রাত্রি তাঁহার চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তি প্রেরণ করিতেছেন।

প্রেমের প্রাণ গান। বিবরের সর্প যেমন বাঁশীর স্বরে বাহিরে আসে, সতীর সঙ্গীতে বা প্রণয়-টানে অসাধু পতিও তেমনি স্বর্গে আসে। তোমার উষা সতী—তাহার প্রেমের গানের স্বরে, তাহার সতীত্ব-পুণ্যের মহীয়সী শক্তিবলে, তোমার যাতনা-দেহ ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া স্বর্গের দ্বারে আনয়ন করিয়াছে।

আরও আজ ভূতচতুর্দ্দশী; মর্ত্ত্য হইতে তোমার পিতা উজ্জ্বল

বা সেই জ্যোতির্ম্ময়ী গন্ধর্ব্বকন্যাকে কত ডাকিলাম, কত কাঁদিলাম—আর সাড়া মিলিল না।

সে যে কি অন্ধকার, তোমরা বুঝিবে কি প্রকারে! অমাবস্যা নিশীথে গভীর ঘনঘটাঘোর প্রলয়ের অন্ধকার দেখিয়াছ—কিন্তু সে অন্ধকারের তুলনায় তাহা কিছুই নহে। কোথায় যাই—কি করি? আমার শান্তি কোথায়?

এই সময় আবার সন্ধ্যার সেই বিকট হাসির উৎকট স্বর আমার কাণে গেল। পশ্চাতে চাহিয়া দেখি—কার্ত্তিকঠাকুরদা, তাহার প্রেত-মুষ্টিতে রক্ত-ছোরা লইয়া আমার দিকে ধাবিত হইতেছে। সেই ছোরার রক্ত-রাগে সেই বিপুল বিরাট অন্ধকার নষ্ট হইল, আমার শরীর আবার ভারি—আবার যাতনাময় হইল। বুঝিলাম—আবার নরকে; সন্ধ্যা কার্ত্তিকঠাকুরদার সহিত নরকোৎসবে যোগ দিতে আসিয়াছি।

সেই অবধি প্রেতপুরীতেই আছি। আমার মাতার সহিত সাক্ষা হইয়াছিল, তিনি এখন স্বর্গবাসিনী। আমাকে দেখা দিয়া অনে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহাকে কয়েক বৎসর পরে মর্ত্ত্যে জ গ্রহণ করিতে যাইতে হইবে, তাহাও বলিয়া গিয়াছিলেন। এখন আমাকে ছাড়িয়া দাও—তোমাদের স্থূল-বায়ুতে আমার বড় কষ্ট হইতেছে। কিন্তু সাবধান;—ইহজীবনের বিন্দুমাত্র কর্ম্মও নিষ্ফল যায় না। মানব-জীবন নিশার স্বপ্ন নহে। ইহকাল আছে, পরকাল আছে—পাপ-পুণ্যের বিচার আছে।

সমাপ্ত

শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।